পাক্ষিক

"খেলাফৎ সংখ্যা"

১১৭-

আহমদী

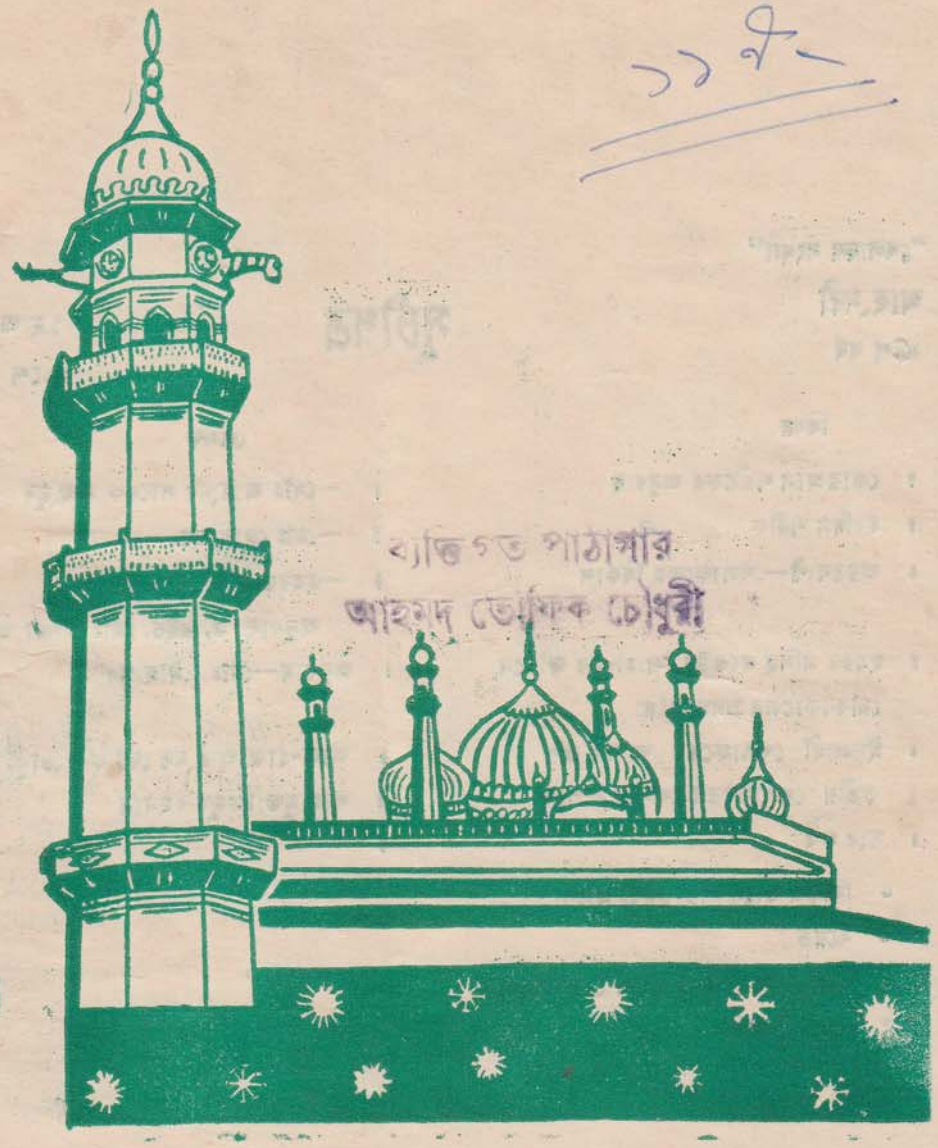

ব্যক্তিগত পাঠাগার
আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

১ম ও ২য় সংখ্যা

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ : ৩১শে মে, ১৯৭২ ইং : ৩১শে হিজরত, ১৩৫১ হিজরী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ--ভারত--৬ টাকা : অন্যান্য দেশ--১৪ শিলিং

"খেলাফত সংখ্যা"

আহ্‌মদী

২৫শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৯ ও ২০শ সংখ্যা

৩১শে মে, ১৯৭২ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
। কোরআন শরীফের অনুবাদ	। —মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	। ২৫৫
। হাদিস শরীফ ঐ	। —মৌঃ মোহাম্মদ	। ২৫৭
। অমৃতবাণী—খেলাফতের বিকাশ	। —হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) অনুবাদ এ, এইচ, মোঃ আলী আনওয়ার	। ২৫৮
। হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনে যৌবনকালের প্রথম রুইয়া	। অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মদ	। ২৬০
। ইসলামী খেলাফতের আসল রূপ	। আল-হাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	২৬১
। তৃতীয় খেলাফতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে	। শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	২৭২
। সংবাদ :	।	পৃঃ ২৭৭

* বিভিন্ন স্থানে সিরাতুন্নবী জলসা
* বয়েত
* বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় খোদ্দামের সম্মেলন
* একটি বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২৩শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা :

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ : ৩১শে মে, ১৯৭২ ইং : ৩১শে হিজরত, ১৩৫১ হিজরী শামসী :

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ

॥ সুরা বনি ইস্রাঈল ॥

১২শ রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০২ ॥ এবং আমরা মূসাকে নয়টি উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়াছিলাম। সুতরাং তুমি বনি ইস্রাইলের নিকট সন্ধান করিয়া দেখ যে যখন সে (মুসা) তাহাদের (অর্থাৎ মিশরবাসীদের) নিকট আগমণ করিয়াছিল, তখন ফেরাউন তাহাকে বলিয়াছিল, "হে মুসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে আত্ম-প্রতারিত বলিয়া মনে করি।"

১০৩ ।। সে (উত্তরে) বলিল, "নিশ্চয় তুমি ইহা জানিয়াছ যে, এই (নিদর্শন) গুলিকে একমাত্র আসমান যমীনের প্রভু সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান দানের উপকরণরূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং হে ফেরাউন! আমি তোমার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত যে, তুমি (তোমার অসৎ পরিকল্পনায়) ব্যর্থ হইবে।"

১০৪ ।। সুতরাং সে তাহাদিগকে (অর্থাৎ মুসা ও তাঁর জাতিকে) দেশান্তরিত করার সংকল্প গ্রহণ করিল। পরিণামে আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গী সকলকে নিমজ্জীত করিলাম।

১০৫ ।। এবং তাহার (নিমজ্জনের পর) বণি ইস্রাঈলকে আমরা বলিলাম যে, তোমরা ঐ (প্রতিশ্রুত) দেশে (যাইয়া শান্তিতে) বসবাস কর। অতঃপর যখন (মুসলমানদের জন্য) দ্বিতীয় বারের (আজাবের) ওয়াদা (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিবে, তখন আমরা (তোমাদিগকে একত্রিত করিয়া সেখানে লইয়া আসিব।

১০৬ ।। এবং এই কোরআনকে আমরা সত্য সহকারেই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং সত্য সহকারেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। এবং আমরা তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও (আজাব সম্পর্কে) সতর্ককারী হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি।

১০৭ । এবং আমরা ইহাকে কোরআন (তথা সুবিন্যস্ত পাঠ্য) করিয়াছি এবং ইহাকে বিভিন্ন খণ্ডে (অর্থাৎ সুরাগুলিতে) বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে তুমি ইহা (সহজ ও) স্থীরভাবে মানুষকে পড়িয়া (বুঝাইয়া) শুনাইতে পার। এবং আমরা ইহাকে অল্প-অল্প পরিমাণে ধীরে ধীরে নাজেল করিয়াছি।

১০৮ ।। তুমি (তাহাদিগকে) বল ঃ তোমরা ইহার উপর ঈমান আন, অথবা নাই বা আন, (ইহাতে কিছু যায় আসে না)। নিশ্চয় যাহাদিগকে ইহার (নযুলের) পূর্বে (ঐশী গ্রন্থাবলী, কিংবা নির্মল মানব প্রকৃতির মাধ্যমে) জ্ঞান দিয়াছেন তাহাদের সামনে যখন ইহা পাঠ করা হয়, তখন তাহারা (ইহা শুনিয়া) পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া সেজদা করে। (সেজদা)

১০৯ ।। এবং বলে যে, "আমাদের রব (সর্বপ্রকার ত্রুটী হইতে) মুক্ত ও পবিত্র এবং আমাদের রবের ওয়াদা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে।

১১০ ।। এবং তাহারা ক্রন্দনরত হইয়া সেজদা করে, এবং ইহা তাহাদিগকে অধিকতর বিনয়ী করিয়া দেয়।

১১১ ।। তুমি (তাহাদিগকে) বল ঃ তোমরা (খোদাকে) আল্লাহ্ (বলিয়া) ডাক, অথবা রহমান (বলিয়া) (মোটকথা) যে নামেই ডাক, (তোমরা ডাকিতে পার)। কেননা সমস্ত উত্তম নাম (ও গুণ) তাঁহারই।' এবং তুমি তোমার প্রার্থনা উচ্চকণ্ঠে বলিও না, বরং উহার মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন কর।

১১২ ।। এবং (সমস্ত জগতকে শুনাইয়া) বল ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি না কোন সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন, না (বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড) শাসনে তাঁহার কোন অংশীদার আছে, এবং না কেহ তাঁহাকে দুর্বল মনে করিয়া (তাঁহার প্রতি দয়া পূর্বক) তাঁহার বন্ধু হয় (বরং যে তাঁহার বন্ধু হয়, সে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য লাভ করার উদ্দেশ্যেই হয়)। তুমি অতি উত্তম রূপে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ কর।

হাদিস শরীফ

খেলাফত, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য

(১)

আল্লাহতায়ালা তোমাদের ধর্মকে নবুওত দ্বারা শুরু করিয়াছেন। যতদিন আল্লাহ্ চাহেন ততদিন নবুওত মোমেনদের মধ্যে কায়েম থাকিবে। অতঃপর উহা উঠিয়া গেলে নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে। যতদিন আল্লাহ চাহেন ততদিন তাহা কায়েম থাকার পর শোষণ ও জুলুমের রাজত্ব কায়েম হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে বিলুপ্ত করিয়া দিলে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতঃপর আল্লাহতায়ালা উহারও অবসান ঘটাইয়া পুনঃরায় নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই বলিয়া তিনি (রসুল করীম সাঃ) নীরব হইয়া গেলেন। (মুসলিম)।

(২)

সেই ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, যে আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না এবং সৎকাজের উপদেশ দেয় না এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলে না। (তিরমিযি)

(৩)

যদি কোন যুবক কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তাহার বয়সের জন্য সম্মান দেখায়, তবে আল্লাহ্ এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে তাহাকে তাহার বার্ধক্যে সম্মান দেখাইবে। (তিরমিযি)।

(৪)

যে কেহ জামাত হইতে এক বৃত্ত দূরে সরিয়া যায়, সে নিশ্চয় ইসলামের জোয়াল নিজ স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেয়। (আবু দাউদ)।

(৫)

নিশ্চয় শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘ সদৃশ যেমন ভেড়ার জন্য নেকড়ে বাঘ, যাহা পাল ছাড়া ভেড়াকে বা যেগুলি ইতস্বতঃ ঘুরিয়া বেড়ায় বা এক কোনে চলিয়া যায়, তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সুতরাং শাখা পথ পরিহার কর এবং জামাত ও সাধারণের সহিত সংযুক্ত থাক। (আহমদ)।

(৬)

তোমরা আমীরের কথা শুন এবং তাহার এতায়াত কর, যদিও তোমাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করা হয় এবং তোমাদের সম্পদ কাড়িয়া লওয়া হয়। সুতরাং শুন এবং এতায়াত কর। (মুসলিম)।

অনুবাদঃ মোহাম্মদ

★

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

দ্বিতীয় কুদরত বা খেলাফতের বিকাশ

আল্লাহ্‌ত'লার চিরাচরিত প্রথা এই যে, যে অবধি তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি সর্বদাই তিনি এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি তাঁহার নবী ও রসুলগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে জয়মণ্ডিত করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ

كتب الله لاغلبن انا ورسلى

অর্থাৎ, "খোদাতা'য়ালা এই বিধান করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার নবী 'গালেব' থাকিবেন।" 'গালবা' শব্দের অর্থ এই যে, রসুল ও নবীগণ যেমন ইচ্ছা করেন যে খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণ ভাবে কায়েম হয় এবং কেহই যেন ইহার সম্মুখীন হইতে সক্ষম না হয়. তদনুসারে খোদাতা'য়ালা প্রবল 'নিদর্শনসমূহ' দ্বারা নবীগণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, খোদাতা'লা তাহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন; কিন্তু তাঁহাদের হস্তে পূর্ণতা লাভ করে না, বরং এমন সময় তাঁহাদিগকে মৃত্যু প্রদান করা হয়, যখন বাহ্যিকভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতা-ব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগকে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ ও উপহাস করিবার সুযোগ দেন। এইরূপে, বিরুদ্ধবাদীগণ হাসি ঠাট্টা করিলে পর খোদাতা'য়ালা আবার তাঁহার শক্তির অপর দিক প্রকাশ করেন এবং এমন উপকরণ উৎপন্ন করেন, যদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সমূহ—যাহা কতক অসম্পূর্ণ রহিয়াছিল, পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ, খোদাতা'লা দুই প্রকার 'কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন ঃ—(১) প্রথমতঃ, নবীগণের যোগে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। (২) তারপর, অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এই (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের এই প্রত্যয় হয় যে. এখন এই জামাত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, এবং এমন কি, জামাতের লোকগণও চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা 'মুরতাদ' হইয়া যায়। তখন খোদাতা'য়ালা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে, তাহারা খোদাতা'য়ালার এই 'মোজেযা' প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল।

তখন, অাঁ-হযরত (সাঃ) এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মক্কা-নিবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভীভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন খোদাতা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, যে সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا

অর্থাৎ, "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়ও এমনি হইয়াছিল। ... ... সেইরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়ও ঘটিয়াছিল।

সুতরাং, হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তা'লার এই বিধান রহিয়াছি যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতা'য়ালা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ, উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না, কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। ইহাই খোদাতা'লা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের জন্য নহে—সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য। যেমন খোদাতা'য়ালা বলিতেছেন ঃ

"আমি তোমার অনুবর্তী এই জামাতকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দান করিব।" সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, যেন ইহার পর সেই দিবস আসিতে পারে, যাহার জন্য চিরপ্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের সেই খোদা প্রতিজ্ঞা পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তিনি তোমাদিগকে সব কিছুই দেখাইবেন, যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদিও বর্তমান যুগ শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ আছে, যাহা অবতীর্ণ হইবার সময় এখন সমুপস্থিত, কিন্তু এ পৃথিবী সেই সময় পর্যন্ত কখনো লয় পাইবে না, যে পর্যন্ত সেই সমুদয় বিষয়ই পূর্ণ না হয়, যাহার সংবাদ খোদা দিয়াছেন। আমি খোদাতা'য়ালার নিকট হইতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি হইবেন, যাঁহারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হইবেন। অতএব, তোমরা খোদার অপর কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করিতে থাক।

(আল-ওসিয়ত, পৃঃ ৫, ৬, ৭, ৮)

অনুবাদ ঃ *এ, এইচ, মোঃ আলী আনওয়ার*

★

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর
জীবনে যৌবনকালের প্রথম রুইয়া

(আরবীর অনুবাদ)

"যৌবনের প্রথমদিকে এক রাত্রিকালে আমি স্বপ্নে দেখি যেন আমি এক বৃহৎ অট্টালিকায় আছি। উহা অতীব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সেখানে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গুণগান ও চর্চা হইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর (সাঃ) কোথায় আছেন। তাহারা আমাকে এক কামরারদিকে ইঙ্গিত করিল। তদনুযায়ী আমি অন্য লোকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই কামড়ার মধ্যে গেলাম। যখন আমি হুজুর (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছিলাম, হুজুর (সাঃ)-বড়ই খুশী হইলেন। তিনি আমার সালামের উত্তমভাবে জওয়াব দিলেন। তাঁহার রূপ, সৌন্দর্য ও লাবণ্য এবং তাঁহার স্নেহ ও মমতাভরা দৃষ্টি এখন পর্যন্ত আমার স্মরণ আছে। আমি উহা কখনও ভুলিতে পারি না। তাঁহার প্রেম আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার রূপবান ও সুন্দর চেহারা আমাকে তাঁহার করিয়া লইয়াছে। তিনি আমাকে তখন বলিলেন, হে আহমদ! তোমার দক্ষিণ হস্তে কি বস্তু আছে? যখন আমি নিজ ডাহিন হস্তের দিকে তাকাইলাম, তখন মনে হইল, আমার হস্তে একটি পুস্তক আছে। এবং উহা আমারই দ্বারা প্রণীত এক পুস্তক মনে হইল। আমি নিবেদন করিলাম, হুজুর ইহা আমার প্রণীত একটি পুস্তক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পুস্তকের নাম কি? তখন অবাক হইয়া আমি পুস্তকের দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করিলাম। আমি দেখিলাম উহা আমার পুস্তকালয়ে রক্ষিত একটি পুস্তকের অনুরূপ এবং উহার নাম কুতবী (ক্রবাক্ষ)। যখন হুজুর (সাঃ) উহা আমার হস্ত হইতে লইলেন, তখন হুজুরের পবিত্র হস্তের স্পর্শ লাগিবামাত্র উহা এক মনোহর ফলে রূপান্তরিত হইল, যাহা দর্শকমণ্ডলির জন্য নয়নাভিরাম ছিল। যখন হুজুর উহাকে চিরিলেন যেভাবে লোকে ফল চিরিয়া থাকে, তখন উহা হইতে পানির মত স্বচ্ছ মধু বাহির হইল এবং আঁ-হযরত (সাঃ) আমাকে যেন অবাক করিবার জন্য ইহা দেখাইতেছিলেন। অতঃপর আমি হৃদয়ে অনুভব করিলাম যে, দরজার চৌকাঠের নিকট এক মৃতদেহ পড়িয়া আছে, যাহার জিন্দা হওয়া আল্লাহ্ তায়ালা এই ফলের সহিত নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই নির্ধারিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) ইহাকে সঞ্জীবিত করেন। আমি যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, তখন সহসা দেখিলাম ঐ মৃতব্যক্তি জীবিত হইয়া দৌড়িয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গেল। কিন্তু তাহার মধ্যে কিছু দুর্বলতা ছিল। মনে হয় সে ক্ষুধার্ত ছিল। তখন নবী করীম (সাঃ) মুচকি হাঁসি হাঁসিয়া আমার দিকে তাকাইলেন এবং সেই ফল টুকরা করিয়া কাটিলেন এবং উহার মধ্য হইতে এক টুকরা হুজুর (সাঃ) স্বয়ং খাইলেন এবং বাকী সব আমাকে দিয়া দিলেন। এইসব টুকরা হইতে মধু ঝরিতেছিল। তিনি বলিলেন হে আহমদ! এই মৃতকে এক টুকরা দাও। উহা

খাইয়া সে শক্তিলাভ করুক। আমি যখন তাহাকে একটি টুকরা দিলাম তখন সে পেটুকের ন্যায় সেইখানেই উহা খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। তখন আমি দেখিলাম আঁ হযরত (সাঃ)-এর আসন উঁচু হইয়া উঠিল। এমন কি উহা ঘরের ছাদের নিকটে পৌঁছিল। তখন আমি দেখিলাম তাঁহার পবিত্র চেহারা এমন উজ্জল হইয়া উঠিল যে, মনে হইতে লাগিল যেন উহার উপর সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ পাত হইতেছে। আমি তাঁহার পবিত্র চেহারার দিকে তাকাইয়াছিলাম এবং মনের আবেগ ও আত্ম-বিহ্বলতায় আমার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। অতঃপর আমি জাগিয়া উঠিলাম। তখনও আমার চক্ষু দিয়া বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিতেছিল। তখন আল্লাহতায়ালা আমাকে অন্তরে প্রেরণা দ্বারা জানাইলেন যে, সেই মৃতব্যক্তি ইসলাম এবং আল্লাহ্তায়ালা আঁ হযরত (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণের দ্বারা আমার মারফৎ উহাকে সঞ্জীবিত করিবেন এবং তোমরা কি জান যে হয়ত সে সময় সন্নিকটে। অতএব তোমরা উহার অপেক্ষা কর। এই রুইয়ায় আঁ-হযরত (সাঃ) আপন পবিত্র হস্ত, নিজ পাক কালাম, নিজ জ্যোতি এবং নিজ (পবিত্রতার বাগানের) ফলের উপহার দ্বারা আমার তরবীয়ত করিয়াছিলেন।

[আইনায়ে কামালাতে ইসলাম (৫৪৮ - ৪৯ পৃঃ)]

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

ইসলামী খিলাফতের আসল রূপ

আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী

আসল বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে কতিপয় বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বিষয়গুলি হল,—(১) খিলাফত কাকে বলে (২) খিলাফত কত প্রকার। খিলাফতের আভিধানিক অর্থ হল,—কারো পিছন পিছন আসা অথবা স্থলাভিষিক্ত হওয়া। খিলাফত কয়েক প্রকারই হতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যেক নবীই খলিফাতুল্লাহ। 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরজে খলিফা' নির্দেশ দ্বারা হযরত আদমের (আঃ) মাধ্যমে এই খিলাফত জারি করা হয়েছে। হযরত দাউদকেও (আঃ) আল্লাহর খলিফা বলা হয়েছে। যথা ঃ—'ইয়া দাউদু জায়াল নাকা খলিফাতান ফিল আরজে ফাহকুম বাইনান্নাছে বিল হাক্কে ওলাতাত্তাবিয়ীনা হাওয়া ফাইউজিল্লাকা আন ছাবিলিল্লাহ্' (ছোয়াদ) নবী আল্লার গুণে গুণান্বিত হয়ে পৃথিবীর বুকে খোদার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। নবী মনগড়া কোন বিধান দ্বারা তাঁর উম্মতকে পরিচালনা করেন না বরং খোদার ইচ্ছাই তাঁর জীবনের আদর্শ ও কর্মের ভিত্তি হয়ে থাকে। তাই আল্লাহতালা বলেন, 'ওমাই ইউতিইর রাছুলা ফাকাদ আতায়াল্লাহ্' (নিছা) অর্থাৎ যে রছুলের অনুসরণ করে সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই অনুসরণ করে। এজন্য নবী মাত্রই আল্লার খলিফা বা খলিফাতুল্লাহ। পবিত্র কোরআন পাঠে আরও যে কতিপয় খিলাফতের পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে

একটি হল, কোন একটি জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর কোন জাতির তাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া। সুরা আরাফের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত ধরণের খিলাফতের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ওয়াজকুরু ইজ জায়ালাকুম খুলাফায়া মিম বাদি কাউমি নূহ।' অর্থাৎ আদ জাতিকে আল্লাহতায়ালা নূহের কৌমের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। অন্যত্র আছে, 'ছামুদকে আদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল।' তদ্রূপ বনি ইসরাইলকে ফেরআউনের ধ্বংশের পর তৎস্থলে খলিফা করা হয়েছে ইত্যাদি। আর এক প্রকার খিলাফত হল, প্রত্যেক নবীর তিরোধানের পর তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরই উম্মতের মধ্য থেকে কোন এক ব্যক্তিকে জাহেরীভাবে সম্মিলিত পরামর্শ দ্বারা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খোদা কর্তৃক নিয়োগ করা। কোরআন শরীফের সুরা নুরের ৭ম রুকুতে আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন, ওয়াদাল্লা হুল্লাজিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুছ ছালিহাতি লা ইয়াছতাখলি ফান্নাহুম ফিল আরজে কামাছ তাখলাফাল্লা জিনামিন কাবালহিম।' অর্থাৎ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে পূর্ববর্তী নবীদের মৃত্যুর পর তাঁদের উম্মতে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের ন্যায় তিনি মোহাম্মদী (দঃ) উম্মতের মধ্যেও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন।' হাদিস পাঠে জানা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন নবী গত হন নাই যার পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত না হয়েছে। স্বয়ং রছুল করিম (দঃ) বলেন, মা কানা নবুওতুন কাত্ত ইল্লা তাবিয়াত হা খিলাফাতুন (কনজুল উম্মাল, জিলদ ৬, পৃ,-১১৯) অর্থাৎ প্রত্যেক নবুওতের পরই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরণের খলিফাকে বলা হয় 'খলিফাতুর রছুল।' এর কারণ সম্বন্ধে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলেন, 'খলিফা রছুলের প্রতিচ্ছবি বা জিল হয়ে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষই অমর নয়, সেজন্য খোদা তায়ালা ইচ্ছা করেছেন যে সর্বোৎকৃষ্ট মানব রছুলের অস্তিত্ব জিল্লিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী করে রাখেন। এজন্যই খোদাতায়ালা খিলাফতের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে মানব জাতি কখনও এবং কোন যুগেই রিছালাতের বরকত থেকে বঞ্চিত না হয়।' (শাহাদাতুল কোরআন, ৫০ পৃঃ)। মহানবীর (দঃ) ইন্তেকালের পর উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ) দ্বারা আল্লাহতায়ালা এই খিলাফত কায়েম করেন।

এখন আমরা সত্য ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত যাকে মান্য করা হযরত রছুল করিম (দঃ) সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন সেবিষয়ে আলোচনা করব। রছুল করিম (দঃ) বলেন "ওয়াছছামরী ওয়াত তায়াতী ওয়া ইন কানা আবদান হাবাশিয়া ফা ইন্নাহু মাই ইয়াশি মিনকুম বাদি ফাছায়ারা ইখ্‌তিলাফান কাছিরাণ ফা আলাইকুম বিছুন্নাতি ওয়া ছুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিনাল মাহ্‌দীয়ীনা।' (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইব্‌নে মাজা) অর্থাৎ যদি কোন হাবশী গোলামও খলিফা হন তাহলে তাঁর কথা মান্য করবে। কেননা আমার পর যারা জীবিত থাকবে তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন সকলে আমার সুন্নত ও সত্য ও সঠিক পথ প্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নতের উপর কায়েম থাকবে। এখানে আঁ হযরত (দঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনকে মান্য করা রছুলকে মান্য করার ন্যায় প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ভন ক্রেমার, নিকলসন, গিবন, আর্ণল্ড, গিবস, টয়েনবি, হিট্টি প্রভৃতি খ্রীষ্টানদের রচিত ইতিহাস পাঠ করে এবং পাশ্চাত্য ঘেষা বিকৃত রাজনৈতিক মতাদর্শের

ফলে অনেকেই মনে করে থাকেন যে, খুলাফায়ে রাশেদীন নিছক রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন। জনসাধারণের ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হতেন এবং তাঁদের মর্যাদা কোন এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান থেকে অধিক নয়। তাঁরা তাঁদের কর্মের জন্য জনগণের কাছে দায়ী ছিলেন এবং জনগণ ইচ্ছা করলে তাঁদেরকে পদচ্যুত ও করতে পারত। পবিত্র কোরআন এবং হাদিস পাঠ করে আমরা অনুরূপ মতের সমর্থন কোথাও দেখতে পাই না। উপস্থিত আলোচনায় আমরা ইসলামী খিলাফতের আসলরূপ কি সেদিকেই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

খিলাফত ও রাষ্ট্র শক্তি ঃ

ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে একটি হল এই যে, রাষ্ট্র শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত কেহ খলিফা হতে পারে না। কিন্তু ধারণাটি এমনই অযৌক্তিক যে খলিফা শব্দের অর্থের সঙ্গেও এর দূরতম সম্পর্ক নেই। খলিফা হলেন নবীর স্থলাভিষিক্ত। হাদিছ পাঠে আমরা জানতে পেরেছি যে প্রত্যেক নবীর পরই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। অথচ সকলই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে নবী মাত্রই রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হন না। জগতে অল্প সংখ্যক নবী ছাড়া আর কোন নবীই রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী ছিলেন না। আদম, নূহ, ইব্রাহিম, ইছহাক, ইছমাইল, ইয়াকুব, মূছা, ইছা প্রভৃতি নবী কেহই কোন রাষ্ট্রের মালিক বা কর্তা ছিলেন না। বরং এদের অধিকাংশই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক ছিলেন। ইব্রাহিম (আঃ) নমরূদ রাজার প্রজা ছিলেন, মূছা (আঃ) প্রথমদিকে ফেরাউন অধিকৃত মিশরের নাগরিক ছিলেন, ইছা (আঃ) হেরোদ রাজার অধীন ছিলেন। তাই তিনি বলতেন, 'কৈসরের যাহা যাহা কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা যাহা ঈশ্বরকে দেও, (মথি ২২ঃ২১)। ইউছুফও (আঃ) কখনও রাষ্ট্রপ্রধান হন নাই, তিনি ছিলেন মিশর রাজের অর্থ ও খাদ্য বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা। অতএব এই নবীগণের মৃত্যুর পর তাঁদের খলিফাগণও কোন রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত হন নাই! মোয়াব অঞ্চলের প্রান্তরে থাকাকালে যখন হযরত মূছা (আঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁরই শিষ্য ইয়াশুয়া বিন নূন। তাঁরই নেতৃত্বে বহু বৎসর পর বণিইছরাইলগণ প্রতিশ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। অপরদিকে দাউদ (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এবং খলিফা সোলেমানও (আঃ) পিতার রাষ্ট্রের অধিকার লাভ করেছিলেন। এই আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম যে যুগনবী রাষ্ট্রের অধিকারী হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফাও সেই রাষ্ট্রের প্রধান হয়ে থাকেন। আর যুগনবী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ না করে থাকলে তাঁদের খলিফাগণও রাজ্যবিহীন খলিফা হয়ে থাকেন। নবীর ন্যায় তাঁরাও নিজ নিজ উম্মতের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে কাজ করে যান। ইবনে খলদুন বলেন, 'কোন কোন সময় খিলাফত রাষ্ট্রশক্তি ব্যতিরেকে কায়েম হয়েছে এবং কোন কোন সময় খিলাফত ও হুকুমত একই সঙ্গে মিলিত হয়েছে।" (মোকদ্দমা ইবনে খলদুন ১৭৪ পৃঃ)। মহানবী (দঃ) শেষ দিকে যেহেতু রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন সেজন্য তাঁর খলিফাগণও আধ্যাত্মিক ইমাম হওয়ার সংগে সংগে দেশের হুকুমতের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাই বলে একথা কখনও সত্য নয় যে খলিফা হতে হলে রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হওয়াও একান্ত জরুরী। খলিফা রাশেদ হওয়ার জন্য যে বিষয়টি অপরিহার্য্য সেটি হল খলিফাকে অবশ্যই তাঁর যুগনবীর রুহানি শক্তির ও আদর্শের সত্যিকার ওয়ারিশ হতে হবে! মসিহে মওউদ (আঃ) বলেন,—"খলিফা স্থলাভিষিক্তকে বলা

হয়। আর রছুলের প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত তিনিই হতে পারেন যাঁর মধ্যে রছুলের কামালাত জিল্লিভাবে বিদ্যমান রয়েছে' (শাহাদাতুল কোরআন ৫৪ পৃঃ)। খেলাফতে রাশেদাকে নবুওতের প্রকাশক বলাও যেতে পারে। মৌলানা আজাদ বলেন, 'এই ধারার প্রাথমিক পর্যায়ের খলিফা ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদিন। তাঁদের খেলাফত ছিল নবুওতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে তাঁরা ছিলেন মসনবে নবুওতীর এবং সামগ্রিক অর্থে রেসালতের স্থলবর্তী। তাঁদের নীতি ও আদর্শ নবুওতের নীতি আদর্শের পুরোপুরি অনুরূপ ছিল। খুলাফায়ে রাশেদীনরা মূলে ছিলেন নবুওতী যুগের অংশ বিশেষ। নবুওত যেমন বহু বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিল তেমনি পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনদের চরিত্রেও বহুবিধ বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিল।'' (ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ৮৭ পৃষ্ঠা) মওদুদী সাহেব তার 'খিলাফত ও মুলুকিয়াত' পুস্তকে বলেন, ''এর পূর্বে আমি বর্ণনা করেছি যে খিলাফতে রাশেদার প্রকৃত সৌন্দর্য এই ছিল যে এতে রছুল আল্লাহ (দঃ)-এর পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব ছিল। খলিফা রাশেদ কেবল রাশেদ বা সৎপথ প্রাপ্তই ছিলেন না বরং মুর্শেদ বা পথ প্রদর্শকও ছিলেন। এর কাজ শুধু রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সৈন্য চালনাই ছিল না বরং আল্লাহর সম্পূর্ণ দীনকে সমষ্টিগতভাবে কায়েম করা ছিল'। (২০১ পৃঃ)।

খলিফার নির্বাচন :

সুরা নুরে খিলাফত সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা যে ওয়াদা করেছেন তা পাঠে জানা যায় যে খলিফা স্বয়ং খোদাই নির্বাচন করে থাকেন। মুমেনরা সত্যিকার ভাবে খলিফা নির্বাচন করেন না, তবে খোদা যাকে খলিফা করতে চান তাঁর হাতেই মুমেনগণ খোদাতায়ালার অদৃশ্য ইঙ্গিতে বয়েত করে থাকেন। নির্বাচন বলতে আজকাল যে বিষয়টি আমাদের সামনে ভেসে উঠে—খলিফা নির্বাচনের সংগে এই পদ্ধতির কোন মিল দেখতে পাওয়া যায় না। মহানবীর (দঃ) নির্দেশ 'আমার উম্মতের আবেদ লোকদেরকে একত্রিত করে পরামর্শ করার জন্য পেশ কর, কোন এক ব্যক্তির রায়ের দ্বারা ফয়সালা করবে না'' (রুহুল মায়ানী জিলদ—২৫, পৃঃ ৪২)—অনুযায়ী মুমেনগণ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে খলিফার হাতে বয়েত করে থাকেন। সত্য খলিফাকে বলা হয় আমিরুল মুমিনীন। এই খেতাব দ্বারাও এ কথাই প্রমাণ হয় যে খলিফা প্রকৃত পক্ষে মুমেনদের ওয়াজিবুল এতায়াত নেতা হয়ে থাকেন। এজন্য খলিফার হাতে রাষ্ট্রের অমুসলীম নাগরিকগণ নয় বরং মুসলীম নাগরিকগণই বয়েত করে থাকেন। উল্লেখযোগ্য যে ইসলামের প্রথম মোজাদ্দিদ ওমর ইবনে আবদুল আজিজের (রহঃ) সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি যখন এজিদের নাম উল্লেখ করতে যেয়ে আমিরুল মুমিনীন শব্দ ব্যবহার করে তখন খলিফা ওমর (২য়) অত্যন্ত নারাজ হন এবং অনুরূপ সম্বোধন করতে তাকে নিষেধ করেন (তাহাজিবু আল তাহ্‌দিব, জিলদ—১১ পৃঃ ৩৬১)। এ ঘটনা থেকেও একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে মুসলমান রাষ্ট্রের প্রধানকেও মুমেনগণ আমীর হিসাবে মান্য করতে পারে না। আমিরুল মুমিনীন একমাত্র রুহানী ইমাম বা খলিফা রাশেদকেই বলা যেতে পারে।

খিলাফতের ওয়াদা আল্লাহ্‌তায়ালা প্রকৃত ঈমানদার ও স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সৎকর্মশীলদের সংগে করেছেন। অতএব, সৎকর্মশীল মুমেন যারা খোদার ইচ্ছাকে ভালভাবে জানেন তাঁরা খিলাফতের উপযুক্ত ব্যক্তির হাত ছাড়া অন্যের হাতে বয়েত করতে পারেন না। মুসলেম জনগণের ঈমানে যখন দুর্বলতা দেখা দেয় তখনই খলিফার নির্বাচনে ফেৎনার সৃষ্টি হয়ে

থাকে; কিন্তু আমলে ছালেহকারী মুমেন যতদিন অবশিষ্ট থাকবে ততদিন খেলাফতে রাশেদাও কায়েম থাকবে। খোদার বানীতে এই ইঙ্গিতই দেখতে পাওয়া যায়। খলিফার নির্বাচন যে খোদাতালাই করে থাকেন তার সমর্থন হাদিছ শরীফেও দেখতে পাওয়া যায়। রছুল করীম (দঃ) বলেন, "আমি আবু বকরকে আমার পর নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পরে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে এটা খোদার কাজ। খোদা কখনও আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে খলিফা করবেন না, আর মোমেনদের জমাতও খোদার ইচ্ছায় আবু বকর ব্যতীত অন্য কারো খিলাফতে সন্তুষ্ট হবেনা।' (বোখারী)। এই সহি হাদিছ দ্বারা প্রমাণ হয় যে খলিফা করা যেহেতু খোদার কাজ, সেজন্য আঁ-হযরত (দঃ) হযরত আবু বকরকে মনোনীত করে যান নাই। তাছাড়া এই হাদিছ দ্বারা এ বিষয়েও ফয়সালা হয়ে গেল যে খোদা যাকে খলিফা করতে চান মুমেনদের জমাতও তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে খলিফা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না; কেননা মুমেনদের অন্তর খোদার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলেন,—'আঁ-হযরত (দঃ) কেন খলিফা নিয়োগ করে যান নাই? এরও বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। তিনি ভাল করেই জানতেন যে আল্লাহ্-তায়ালা স্বয়ং এক খলিফা নিয়োগ করবেন। কেননা ইহা খোদারই কাজ আর খোদার নিযুক্তিতে কোন ত্রুটি থাকতে পারে না। অতএব আল্লাহতায়ালা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে এই উদ্দেশ্যে খলিফা নিযুক্ত করলেন।' (আল-হাকাম ১৪ এপ্রিল ১৯০৮) আপন যুগের অদ্বিতীয় সত্য দ্রষ্টা আলেম হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন (রাঃ) বলেন, 'খলিফা বানান মানুষের কাজ নয় ইহা খোদাতায়ালার নিজের কাজ' (বদর ২১ জানুয়ারী ১৯১২ ইং)।

খলিফার পদচ্যুতি ঃ

নবুওত প্রাপ্তির পর মৃত্যু পর্যন্ত যেমন নবীকে উম্মতের কাণ্ডারী হয়ে থাকতে হয় তেমনি খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর খলিফাকেও আমরণ তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলতে হয়। কোন মানুষ যেহেতু খলিফা নিযুক্ত করে না সেজন্য মানুষের পক্ষে পদচ্যুত করাও সম্ভবপর নয়।

খোলাফায়ে রাশেদীন আমরণ খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রছুল করীম (দঃ) উছমানকে (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ তোমাকে একটি পোষাক দ্বারা সজ্জিত করবেন। যদি কেহ তা খুলে নিতে চায়, খুলে দিও না।' (তিরমিজী, ইবনে মাজা)।

হাদিছবিদগণের সম্মিলিত অভিমত এই যে, ভবিষ্যদ্বানীতে বর্ণিত পোশাকের অর্থ হল খিলাফত। এই ভবিষ্যদ্বানীতে বর্ণিত রছুলের নির্দেশ অনুযায়ী ভয়াবহ বিপদের মুখে জীবন বিপন্ন জেনেও তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বিরুদ্ধবাদীদের পদত্যাগ দাবীর জবাবে তিনি বল্লেন, 'আমি কি তলওয়ারের বলে খলিফা হয়েছি যে তোমরা তরবারীর ভয় দেখিয়ে আমাকে খলিফার পদ থেকে অপসারণ করবে?' (তাবাকাত ইবনে ছাদ, জিলদ-৩, পৃঃ ৬৮) এ বিষয়ে খলিফা সালেস হযরত আবদুল্লা বিন ওমরকে (রাঃ) পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বল্লেন, 'আপনি মুসলমানদের জন্য এমন পথ খুলে দিবেন না যাতে কিছু সংখ্যক লোক তাদের আমীরের উপর অসন্তুষ্ট হলেই যেন পদচ্যুত করতে পারে।' (তাবাকাত, জিলদ ৩, পৃঃ ৬৬)। খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রাঃ) বলেন, 'খোদা-তায়ালা কর্তৃক নির্বাচিত খলিফাকে কোন শক্তিই

পদচ্যুত করতে পারেনা। এজন্য তোমাদের মধ্যে কেহই আমাকে পদচ্যুত করার অধিকারী নও। যদি আল্লাতালা আমাকে পদ হইতে অপসারিত করতে চান তাহলে তিনি আমাকে মৃত্যুদান করবেন। (বদর, জানুয়ারী ২১, ইং ১৯১২)

এখানে আমর ইবনুল আস ও আবু মূসা আশারী (রাঃ) কর্তৃক হজরত আলীর (রাঃ) পদচ্যুতির কথা উঠতে পারে, কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে হজরত আলী (রাঃ) এই সমাধানকে কখনও মেনে নেননি, বরং তিনি এটাকে অবৈধ পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করে বলেন, 'শুন এই দুই ব্যক্তি যাদেরকে তোমরা সালিস নিয়োগ করেছিলে তারা কোরআনের ফয়সালাকে পিঠের পিছনে ফেলে দিয়েছিল। আর খোদার নির্দেশের পরিবর্তে তাদের নিজ নিজ ধারণাকে অনুসরণ করেছিল। এবং এমন এক ফয়সালা দিয়েছিল যা স্পষ্ট বিধান ও অতীত সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা, আর এই ফয়সালাতে উভয়ের মতভেদও দেখা দিয়েছিল।' (তাবারী, জিলদ-৪, পৃঃ ৫৭) অবশেষে হযরত আবু মূছা (রাঃ) নিজের ভুল বুঝতে পেরে হযরত আলীকে (রাঃ) আর মুখ দেখান নাই। তিনি চিরদিনের জন্য মক্কায় চলে যান। (ইবনে খালদুন, জিলদ ২, পৃঃ ১৭৮) হযরত আলীর (রাঃ) এই বর্ণনা থেকেও দেখা যায় যে তাঁকে খিলাফত থেকে অপসারনের জন্য যে রায় দেওয়া হয়েছিল তা কোরআন ও সুন্নতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

খলিফার এতায়াত :

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদিস, 'আলাইকুম বিছুন্নাতি ওয়া ছুন্নাতি খোলাফাইর রাশিদিনাল মাহ্‌দিয়ীনা' দ্বারা জানা গিয়েছে যে খলিফার আদেশ নির্দেশকে মান্য করা রসুল করিমের (দঃ) আদর্শকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার ন্যায়ই জরুরী। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা 'আতিউল্লাহা ওয়া অতিউর রাছুলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম' (নেছা)—নির্দেশ দ্বারা আল্লা, রছুল ও উম্মতের উলিল আমরদের এতায়াত করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ করেছেন। রছুল করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, 'পছন্দ হউক আর না হউক মুসলমানের জন্য আমীরের এতায়াত করা ফরজ।' (বোখারী, মুসলেম, আবু দাউদ, নেছায়ী, ইবনে মাজা)। হজরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'যতক্ষণ আমি আল্লা ও রছুলের এতায়াত করে চলি ততদিন তোমরাও আমার এতায়াত কর। আর আমি যদি আল্লাহ ও রছুলের নাফরমানি করি তাহলে তোমরা আমার এতায়াত করতে বাধ্য নও।' (কাঞ্জুল উম্মাল, জিলদ ৫, হাদিছ নং ২২৮২)

উল্লেখযোগ্য যে খোদা কর্তৃক মনোনীত খলিফা কখনও খোদা ও রছুলের নাফরমানি করতে পারেন না। কেননা খলিফার মন ও মগজ খোদার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) একদা বলেছিলেন, 'আমি আল্লার ফরমাবরদারী করে যখনই তোমাদেরকে কোন আদেশ দেই তোমাদের জন্য তা মান্য করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য যদিও তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয়ও হয়। (কঞ্জুল ওম্মাল, জিলদ ৫, হাদিস নং ২৫৮৭)

এখানে স্বাভাবিকভাবে কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যেমন, হযরত আয়শা, তালহা, জুবায়ের (রাঃ) প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তিদের 'জঙ্গে জমলে' খলিফার বিপক্ষে থাকা কি তাহলে অন্যায় বলে গণ্য হবে না? তেমনি আমির মাবিয়া, আমার ইবনুল আস ও আরো কতিপয় প্রসিদ্ধ সাহাবার ৪র্থ খলিফার বিরুদ্ধাচরণ কি অপরাধ ও পাপকার্য

নয়? এখন আমরা এই বিষয়গুলি নিম্না সংক্ষেপে আলোচনা করব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে হযরত উছমানের (রাঃ) হত্যাকাণ্ডের সংগে যারা জড়িত ছিল তাদের মধ্যে কোন ছাহাবী ছিলেন না। হযরত উছমানের (রাঃ) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিশরে যে দলটির সৃষ্টি হয় তার নেতা ছিল নব দীক্ষিত আবদুল্লা ইবনে সাবা। ঐতিহাসিক ভন ক্রেমারের অভিমত এই যে, 'ইসলাম গ্রহণের ভান করলেও ইবনে সাবা ছিল প্রকৃত পক্ষে ইহুদী' (Politics in Islam by S. Khuda Baksh)। ইবনে সাবা হযরত আলীর (রাঃ) প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করে জনসাধারণকে তৃতীয় খলিফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করত। সে প্রচার করত যে, খলিফা কেবল আলীর বংশ থেকেই হবে। ভনক্রেমার লিখেছেন যে, "দক্ষিণ আরবের এই ইহুদীটি বলত যে, ঐশী আত্মা আলীর (রাঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিছুকাল পর তিনি ধরাধামকে পরহেজগারীতে পূর্ণ করে দেবেন।' এই ধারণা উগ্রপন্থী শিয়াদের মধ্যেও বদ্ধমূল হয়ে যায়।' (Politics in Islam)। ইবনে সাবার চক্রান্তে মিশর, কুফা বসরার বেশ কিছু সংখ্যক লোক যাদের মধ্যে অধিকাংশই নও মুসলীম ছিল এই আন্দোলনে যোগদান করে। এই দল হযরত আলী, তালহা এবং জুবায়েরকেও (রাঃ) তাদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এই তিন বুজুর্গই তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং খলিফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির জবাব দান করেন। (মৌদুদীকৃত, খিলাফত ও মুলুকিয়ত, পৃঃ ১১৭)। দুঃখের বিষয় হজরত আবু বকরের (রাঃ) কণিষ্ঠপুত্র তরুণ মোহাম্মদ এদের চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়েন। মোহাম্মদের বিধবা মাতাকে হজরত আলী (রাঃ) নিকাহ করেছিলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই বালক মোহাম্মদ সৎপিতা আলীর (রাঃ) অন্নেই পালিত হচ্ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন ওরা নবী পরিবার ও আলীর (আঃ) খুবই ভক্ত তখন অদূরদর্শীতার অভাবে অথবা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় বিদ্রোহীদের সহযোগী হয়ে পড়েন। এই বিদ্রোহীদলের এক বিরাট অংশ মদিনায় প্রবেশ করে অরাজকতার সৃষ্টি করে। এমনকি তারা উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে হাবিবাকেও (রাঃ) অপমান করতে ছাড়ে নাই। এই অবস্থা লক্ষ করে উম্মুল মুমেনীন হজরত আয়শাও (রাঃ) অপমানের ভয়ে মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। (তাবারী জিলদ-৩) স্মরণ রাখা দরকার যে, ঐ যুগে এখনকার মত সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য ছিল না। বিভিন্ন লোকমুখে যে সংবাদ পাওয়া যেত তারই উপর নির্ভর করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। উছমান (রাঃ) হত্যার বেদনাদায়ক খবর যখন মক্কায় মা আয়শার কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে খিলাফতের দুশমনদের মোকাবেলা করার জন্য যাত্রা করলেন। হজরত তালহা ও জুবায়েরও (রাঃ) হজ উপলক্ষে মক্কায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও হজরত আয়শার (রাঃ) সঙ্গে যোগদান করলেন। বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, এই অভিযোগ হজরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে ছিলনা, ছিল ইবনে সাবার শিষ্য খলিফা সালেসের হন্তাদের বিরুদ্ধে। এদিকে বিদ্রোহীগণ, নিজেদের পরিণামের কথা চিন্তা করে নূতন খলিফা হজরত আলীর (রাঃ) হাতে বয়েত করে নিজেদের পাপ ঢাকার ও জান বাঁচাবার চেষ্টা করে। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় কয়েক হাজার ছিল। তাই হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষে ক্ষমতা সম্পূর্ণ হাতে না নিয়ে এদের বিচার করাও সম্ভবপর ছিলনা। ৩য় খলিফার হন্তাদের বিচারের দাবী করা হলে

৪র্থ খলিফা বল্লেন, 'অবস্থা আয়ত্তে আসতে দিন, সময়ে সব কিছুরই ব্যবস্থা করা হবে।' (তাবারী, জিলদ ৩ পৃঃ ৪১৮)

সুযোগ সন্ধানী এবং অধৈর্যশীলরা এই কথায় শান্ত না হয়ে খলিফার বিরুদ্ধে আর একটি দলের সৃষ্টি করল। আমীর মাবিয়া এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। হযরত উছমানের (রাঃ) হন্তাদেরকে হস্তান্তর করার জন্য আমীর মাবিয়ার দাবী হযরত আলী (রাঃ) এজন্যই প্রত্যাখ্যান করেন যে তাঁর দৃষ্টিতে উভয়দলই ছিল বিদ্রোহী, বাগী। একদল ৩য় খলিফার নেতৃত্ব অস্বীকার করে তাঁকে হত্যা করেছিল, অপর দল ৪র্থ খলিফার হাতে বয়েত গ্রহণ না করে কেসাসের উদ্দেশ্যে সংগ্রামে রত। অতএব বিদ্রোহীকে বিদ্রোহীর হাতে সমর্পণ করার প্রশ্নই উঠেনা।

ওদিকে বসরার নিকটবর্তীস্থানে হযরত আয়শার (রাঃ) দল এবং হযরত আলীর (রাঃ) বাহিনী সামনা-সামনি গিয়ে উপস্থিত হল। হযরত আলী (রাঃ) ভুল ধারণা দূর করার জন্য হযরত জুবায়ের ও তালহাকে (রাঃ) আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা উভয়েই এসে হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আলোচনায় হযরত জুবায়ের নিজের ভুল বুঝতে পেরে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন, হযরত তালহাও প্রথম কাতার থেকে সরে পিছন কাতারে চলে গেলেন। (তাবারী, ইবনে আছির, ইবনে খানদুন প্রভৃতি) উভয় পক্ষ এক হয়ে গেলে অপরাধীদের নিস্তার নেই ভেবে দুস্কৃতিকারীরা হযরত জুবায়ের ও তালহাকে কতল করে ফেলল। ফলে শান্তি স্থাপনের পরিবর্তে এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে দশ হাজার লোক প্রাণ হারায়। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনাটি কলঙ্কের কালিমায় আচ্ছাদিত। হযরত আয়শা (রাঃ) যখন পরে এই ঘটনার পিছনে অশুভ শক্তির হাত ছিল বলে জানতে পেরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন তখন তিনি নিজের কর্মের জন্য আফসোস করে ক্রন্দন করতেন। ক্রন্দনের ফলে তাঁর দুপাট্টার আচল ভিজে যেত। (শরহে ফিকাহ আকবর, পৃঃ ৮২)

শেষ জীবনে হযরত আবদুল্লা বিন ওমর (রাঃ) আফসোস করে বলতেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পরিতাপ হল আমি কেন হযরত আলীকে (রাঃ) সাহায্য করি নাই।' (ইবনে ছাদ, জিলদ ৪ পৃঃ ১৮৪)। হযরত ইবনুল আছও হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধাচরণের জন্য সারা জীবন ভর আক্ষেপ করে গেছেন। (আল ইছতিয়াব জিলদ ১ পৃঃ ৩৭১)। এখানে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার যে হযরত আলীর (রা) বিরুদ্ধাচরণ যেই করে থাকুক না কেন সেটা বিদ্রোহের মধ্যে গন্য। হাদিস দ্বারাও একথাই প্রমাণিত হয়। রছুল করিম (দঃ) একদা সাহাবী আম্মার বিন ইয়াছির (রাঃ) সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হবেন। (আল ইছতিয়াব, জিলদ ২ পৃঃ ৪২৪)। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আম্মার (রাঃ) খলিফার পক্ষে যুদ্ধ করে আমীর মাবিয়ার সৈন্যদের হাতে নিহত হন। এ সম্বন্ধে হাফেজ ইবনে কাছির বলেন 'এর দ্বারা এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে আলী (রাঃ) সত্যের উপর ছিলেন।' (আল বাদায়া, জিলদ ৭ পৃঃ ২৭০)। খোদার তরফ থেকে আগত হাকাম হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলেন, 'আসল কথা, সত্য হযরত আলী মোর্তাজার (রাঃ) পক্ষে ছিল। অতএব তাঁর সময়ে যে ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে মোকাবেলা করেছে সে বিদ্রোহ করেছে এবং সরকশি দেখিয়েছে।'

(সির্রুল খেলাফা)

খিলাফত ও পরামর্শ সভা ঃ

রছুল করিমকে (দঃ) আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ওয়া আমরু হুম শুরা বাইনা হুম' (শুরা) তাই খলিফাতুর-রছুলগণও মজলিসে-শুরা বা পরামর্শ সভার আহ্বান করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, 'লা খিলাফাতা ইল্লা আন মুশারেরাতেন)' (কাঞ্জুল ওম্মাল, জিলদ ৫, হাদিছ নং ২৩৫৪)। অর্থাৎ পরামর্শ ছাড়া কোন খিলাফত হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে খলিফা মজলিসে শুরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন এবং তিনি মজলিসের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য। প্রকৃত পক্ষে খলিফা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছা হলে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন, ইচ্ছা হলে সকলের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অনেকে মনে করতে পারেন যে খলিফা যদি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন তাহলে ত'াকে Dictator ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? খলিফা সকলের মত উপেক্ষা করে নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও একথা স্মরণ রাখা দরকার যে তিনি কখনও খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না। তিনি যদি কখনও সকলের মত উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করেন তাহলে মনে করতে হবে যে নিশ্চয়ই তিনি খোদার ইচ্ছায়ই একাজ করেছেন কেননা স্বয়ং খোদাই খলিফাকে নিয়োগ ও পরিচালনা করেন। খোদা সম্বন্ধে যাদের ধারণা অস্পষ্ট তারা হয়ত একথা সহজে মেনে নিতে রাজী নাও হতে পারেন। কিন্তু যারা যুগে যুগে খোদায়ী তজল্লিয়াত দর্শন করেছেন এবং যারা খোদাকে সত্য ধর্মের নিয়ন্তা বলে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেন তারা অবশ্যই একথা স্বীকার না করে পারেন না। খোদার সংগে যদি ধর্মের সরাসরি কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে ধর্ম ও অন্যান্য মতবাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। তাই আমরা দেখতে পাই মহানবীর (দঃ) ইন্তেকালের পর আরবের অধিকাংশ গোত্র এবং এলাকা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন সকলই নব-নির্বাচিত খলিফা আওয়ালকে উছামার (রাঃ) নেতৃত্বে প্রেরিত সৈন্য-বাহিনীকে সিরিয়ায় প্রেরণ না করে বিদ্রোহ দমনে প্রয়োগ করতে পরামর্শ দেন ; কিন্তু খলিফা খোদার ইচ্ছায় সকলের পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফল যে ইসলামের জন্য খুবই উৎকৃষ্ট হয়েছিল সেকথা ইতিহাস পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন।

খিলাফত ও রাজনীতি ঃ

রাজনীতি বলতে যদি রাজার নীতি বা কুটনীতি বুঝায় তাহলে খিলাফতের সংগে এর কোন সম্পর্ক নেই। রাজনীতিকে আরবীতে বলা হয় সিয়াসত। সিয়াসত শব্দটি কোরআন হাদিছে এমনকি প্রাচীন আরবী সাহিত্যে কোথাও খোঁজে পাওয়া যাবে না। এটি নুতন শব্দ। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহুপর এর প্রচলন হতে শুরু করে। ইসলামের অপর নাম 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বা সরল পথ। এর সংগে কুটনীতি Diplomacy বা বক্রতার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের যেদিন থেকে রাজনীতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে সেদিন থেকেই ইসলামের অধঃপতন শুরু হয়েছে। হজরত ওছমান (রাঃ) ও হযরত আলীর (রাঃ) হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক চক্রান্তেরই ফল। হযরত উছমানের (রাঃ) হত্যাদ্বারা ইসলামের উপর যে রাজনৈতিক আঘাত হানা হয় তার জের এখনও শেষ হয় নাই। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় হারুরা নামক স্থানে, ৬৫৮ সালের ২২শে মার্চ, আবদুল্লা-বিন ওয়াহাবের নেতৃত্বে। এই দল খারেজী নামে সমধিক পরিচিত। ইসলামে সর্বপ্রথম রাজা হলেন হযরত মাবিয়া তিনি নিজেই বলতেন, 'আনা আওয়ালুল মুলুক'

আমি ইসলামে প্রথম রাজা (মোয়াত্তা ২য় খণ্ড, ১০৬ পৃঃ)। কথিত আছে যে, হযরত ছাদ বিন আবি আক্কাছ (রাঃ) হযরত মাবিয়ার সংগে সাক্ষাৎ কালে বলেছিলেন; আচ্ছালামু আলাইকা আইউহাল মলেকু।' হযরত মাবিয়া বলেন, "আপনি আমিরুল মুমেনীন না বলে রাজা বলেন কেন?' উত্তরে হযরত ছাদ বলেন, 'খোদার কছম, যেভাবে আপনি এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন অনুরূপভাবে যদি আমাকে এই ক্ষমতা দান করা হত তাহলে আমি তা কখনই গ্রহণ করতাম না।' (ইবনে আছির, জিলদ ৩ পৃঃ ৪০৫)। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 'মসালায়ে খিলাফত' নামক পুস্তকে 'আসহাবে সুনান' পুস্তকের উদ্ধৃতি পেশ করে লিখেছেন, 'প্রথমোক্ত হুকুমতে রছুলুল্লাহর আদর্শ পুরাপুরি বিদ্যমান থাকার কারণে হাদিছ শরীফে তাকে খেলাফত এবং শেষোক্ত ধারার মধ্যে রাজনীতি ও ব্যক্তি প্রাধান্য থাকার কারণে তাকে বাদশাহী বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।' ইসলামের প্রথম রাজা মাবিয়ার সময় থেকে যে রাজনীতি শুরু হয়েছে তার দৌড় আজো শেষ হয়নি। ধর্মের সংগে রাজনীতির যে সংযোগ ঘটেছিল তা থেকে খালেছ দীনকে পৃথক করা অনেকের জন্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে ইসলামের নামে রাজনীতিবিদ জনাব মৌদূদী তার পুস্তক খিলাফত ও মুলুকিয়তে স্বীকার করেছেন যে, হযরত মাবিয়া (রাঃ)-এর যুগে রাজনীতিকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দেওয়ার এবং রাজনৈতিক কারণে শরিয়তের বিধানকে ভঙ্গ করার যে রেওয়াজ চালু হয় তা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইয়াজিদের যুগে নিকৃষ্টতম স্তরে গিয়ে উপনীত হয়।' (১৭৯ পৃঃ)। এরপর লিখছেন, 'এরপর মারওয়ান এবং তাঁর সন্তানদের শাসনকালে ধর্ম থেকে রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে, বরং রাজনীতির জন্য ধর্মীয় বিধান সমূহকে বলি দেওয়া হয়।' (১৮৪)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রাঃ) ব্যতীত সমগ্র উমাইয়া ও আব্বাসিয়া যুগে ধর্মের উপর রাজনীতির প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। তাই খলিফাতুল মসিহ্ সানীর (রাঃ) নির্দেশ হল, ".....পার্থিব শাসন ব্যবস্থা এবং খেলাফত পৃথক হওয়া উচিত, কেননা যাতে করে শরিয়ত ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে.....আমার অভিমত হল, যদি কখনও ক্ষমতা আসে তাহলে খলিফাগণকে সব সময় রাজনীতি থেকে পৃথক থাকতে হবে এবং কখনও শাসন ক্ষমতাকে নিজের হাতে গ্রহণ করার চেষ্টা করবেনা; অন্যথায় রাজনৈতিক দলগুলির সংগে খিলাফতের সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে এবং খিলাফত একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়ে যাবে; আর খলিফার অস্তিত্ব বাপ সদৃশ থাকবেনা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে খিলাফত এবং শাসন ব্যবস্থাকে একত্রিত করা হয়েছিল কিন্তু তা অপারগ অবস্থায় করা হয়েছিল, কেননা তখনও শরিয়ত পূর্ণভাবে জারী হয় নাই" (আল-ফজল ১২ ডিসেম্বর ১৯৪৪) অতএব খলিফা সম্বন্ধে ইসলামের নির্দেশ হল, "তিনি রাজনীতির উর্দ্ধে, কেননা কোন পার্টির সংগে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই—তিনি পিতৃতুল্য, তাই কোন দলে শামিল হওয়া অথবা তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া জায়েয নহে। আল্লাহতায়ালা বলেন, ওয়া ইজা হাকামতুম বাইনান্‌নাছে আন্‌তাহ্‌কুমু বিল আদ্‌লে" অর্থাৎ যখন এহেন ব্যক্তির (খলিফা) নির্বাচন হয়ে যাবে তখন তাঁর কর্তব্য হবে ইনসাফের সংগে ফয়সালা করা এবং কোন ব্যক্তি বা দলের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ না করা। " আল-ফোরকান মে ১৯৬৭ ইং)

খিলাফত সম্বন্ধে মহানবীর (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণীঃ

রছুল করিম (দঃ) বলে গিয়েছিলেন, 'খিলাফত আমার পর ত্রিশ বৎসর কায়েম থাকবে অতঃপর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।' (মেশকাত) সারা পৃথিবী এই হাদিসের সত্যতার সাক্ষ্য দেবে।

অপর এক হাদিছে আঁ-হযরতের (দঃ) আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে। যথা, 'তোমাদের ধর্ম নবুওত দ্বারা শুরু হয়েছে, আল্লাহ যতদিন চান তা কায়েম থাকবে অতঃপর তৎস্থলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, আল্লাহর ইচ্ছায় এই খিলাফত কিছুকাল চলার পর তা উঠে যাবে এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু খোদার ইচ্ছায় এই রাজতন্ত্রও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আবার 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওত' অর্থাৎ নবুওতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন পৃথিবীতে পুনরায় প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।' ইত্যাদি (ছহি হাদিস সমূহ)। এই হাদিছের মধ্যে ইসলামের উত্থান, পতন ও পুনরুত্থানের সম্পূর্ণ চিত্রটি অঙ্কিত রয়েছে। জগদবাসী মহানবীর (দঃ) পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছে। ৪র্থ খলিফা হযরত আলীর (রাঃ) শাহাদাতের পর ত্রিশ বৎসর মেয়াদের মধ্যে হযরত মাবিয়া দ্বারা রাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছে। এরপর? এরপর রাজতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের যুগে আল্লাহ-তায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মসিহে মওউদকে (আঃ) প্রেরণ করে 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওত' প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামী খিলাফত সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণের কারণে বহুলোক এই খিলাফতকে আজো চিনে নিতে পারছেন না কিন্তু যে পরাক্রমশালী খোদা এই ভবিষ্যদ্বাণীর বৃহৎ অংশকে সকলের কাছে সত্যরূপে প্রকাশিত করেছেন তিনি অবশিষ্ট অংশটিকেও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। আকাশ থেকে গ্রহ নক্ষত্র খসে পড়তে পারে, জমিনের বিশাল সাগর-পাহাড় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে কিন্তু খোদার রছুলের বাণী কখনও ব্যর্থ হতে পারেনা। মৌলানা আজাদ বলেছিলেন, 'বহু সংখ্যক হাদিছে ইসলামের পরবর্তী একটি যুগেরও সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সে যুগের কল্যাণ এবং বৈশিষ্ট্য ইসলামের প্রাথমিক যুগকে জীবন্ত করে তুলবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রাথমিক যুগ ভাল ছিল -না পরবর্তী যুগ ভাল হবে তা বলা সম্ভব নয়। কেননা আল্লার ঘোষণা "লি-ইউজ-হিরাহু আলাদ-দ্বীনে কুল্লেহি" তখন পূর্ণভাবে সফল হবে। এই হচ্ছে কারণ যেজন্য দুনিয়ার চতুর্দিকে ব্যাপক নিরাশা এবং অন্ধকারের মধ্যেও একজন মুমেনের অন্তরে বিজয় এবং সফলতার আলো অহেনিশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। বরং অন্ধকার যতই ঘনিভূত হচ্ছে ততই যেন প্রভাত ঘনিয়ে আসছে।" (মসালায়ে খিলাফত-এর বাংলা অনুবাদ ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ৯০ পৃঃ)

★ ★

"দেখ, ঐ যুগ আসিতেছে, পরন্তু নিকটে আসিয়া গিয়াছে, যখন আল্লাহ তায়ালা এই সেলসেলাকে পৃথিবীতে অত্যন্ত বরণীয় করিয়া তুলিবেন। ইহা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে প্রসার লাভ করিবে এবং দুনিয়ায় ইসলাম বলিতে একমাত্র এই সেলসেলাকেই বুঝাইবে। ইহা সেই আল্লাহ তায়ালার বাণী, যাঁহার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।"

—হযরত মসিহ্-মওউদ ইমাম মাহ্দী আঃ

তৃতীয় খেলাফতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

—শাহ মুস্তাফীজুর রহমান

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসসালামের তৃতীয় খেলাফৎ চলছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) স্বয়ং হযরত রসুল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-আলেহী ওয়াছাল্লামের এবং তাঁর খেলাফৎ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেলাফতের দ্বিতীয় বিকাশ। এই অর্থে হযরত খলীফাতুর রসুল ছালেছের প্রতিরূপ হলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ ছালেছ। সুতরাং হযরত হাফেয মির্জা নাসের আহমদ অইয়েদাহুল্লাহু তা'য়ালার আমলে হযরত ওসমান যিন্নুরায়েন রাজিয়াল্লাহু তায়ালার খেলাফতকালের ঘটনাবলীর প্রতিফলনের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

হজরত খলীফাতুল মসীহ ছালেছ (আইঃ) সম্পর্কে বহু ভবিষ্যৎবানী রয়েছে। তা থেকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বানীর উল্লেখ আমরা এখানে করতে চাই। বানীটি হযরত মসীহ মওউদের (আঃ) নিজের। এই বানীটিকে আমাদের মুকাররম আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব তাঁর 'হাশর' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

(ক) "খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার সেলসেলাতেও তীব্র মতবিরোধ দেখা দিবে। ফেৎনা-বাজ ও স্বার্থপর ব্যক্তিগণ পৃথক হয়ে যাবে। তারপর খোদা এই ফেৎনা দূর করবেন।

(খ) "বাকী যারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগ্য, যারা সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে না এবং ফেৎনাকারী তারাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

(গ) "এরপর দুনিয়াতে এক হাশর উপস্থিত হবে, এবং তা হবে প্রথম হাশর। তখন সমস্ত বাদশাহ পরস্পরকে আক্রমণ করবে, এবং এমন যুদ্ধ সংঘটিত হবে যে, রক্তে যমীন ভরে যাবে। প্রত্যেক রাজার প্রজারাও পরস্পর ভয়ংকর লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। বিশ্বজোড়া ধ্বংস সাধিত হবে। এইসব ঘটনার কেন্দ্র হবে শাম দেশ।

(ঘ) "সাহেবজাদা সাহেব! (হযরত সের জুল হক নোমানী রাজিঃ) তখন আমার প্রতিশ্রুত পুত্র থাকবে। খোদা এই ঘটনাগুলোকে তার সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছেন।

(ঙ) "এই সকল ঘটনার পর আমার সেলসেলার উন্নতি হবে। সালাতীন—রাজন্যবর্গ আমার সেলসেলায় দাখিল হবেন।

(চ) "আপনারা সেই মওউদকে—প্রতিশ্রুতকে চিনে নিবেন।" (তাজকেরা, নব সংস্করণ—৭৯৯ পৃষ্ঠা)

একথা অবিসংবাদিত যে, এই প্রতিশ্রুত বা মওউদ পুত্রই হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ)। উল্লিখিত হাশর প্রবন্ধটিতে একথাই যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

মুহতারাম আমীর সাহেব তাঁর প্রবন্ধটিতে ভবিষ্যৎ-বানীর (ক, অংশের প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়ালের (রাজিঃ) এন্তেকালের পর মৌলানা মুহম্মদ আলী গং কর্তৃক সৃষ্ট ফেৎনা ; এবং (খ) অংশের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানীর (রাজিঃ) আমলে মোঃ আবদুল মান্নান ও তার দল কর্তৃক সৃষ্ট ফেৎনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যার সিদ্ধতায় সন্দেহ নেই। তবে, একথাও বোধ করি যৌক্তিক হবে যে, উক্ত ঘটনাগুলো তৃতীয় খেলাফতের পূর্বেকার। কাজেই,

মওউদ পুত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত ফেৎনাগুলো বর্তমান খেলাফতের আমলেই সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা সমধিক। এবং এ কারণে, হযরত ওসমানের (রাঃ) আমলের ফেৎনার পুনরাবর্তন – আশঙ্কাও অমূলক হবে না।

সবাই জানেন, হযরত ওসমানের (রাঃ) আমলে সৃষ্ট ফেৎনার কারণ সম্পর্কে ইতিহাস নানাবিধ মতামত পেশ করে থাকে। প্রচলিত ইতিহাসের লেখকদের কেউ কেউ দেখতে পান স্বয়ং খলীফার ত্রুটি, কেউবা হযরত আলীর (রাঃ)। কিন্তু সত্যিকার ঘটনার সঙ্গে ঐ সকল মত ও অমতের সম্পর্কের মধ্যকার ব্যবধান এত বেশী বিস্তৃত যে, প্রকৃত ঘটনা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঐ ফেৎনার সঙ্গে না খলীফা, না হযরত আলী, না সাহাবায়ে কেরামের অন্য কেউ জড়িত ছিলেন। এমন কি আমীরগণ – মারোয়ান, অলীদও – এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। (দেখুন ঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত 'ইসলাম মে ইখ্তেলাফাৎ কা আগাজ')।

ফেৎনা সেদিন যে সকল কারণে সংঘটিত হয়ে ওঠেছিল, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল – সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ নও মুসলিমরা জীবনের মূল্যায়ন করতো পার্থিব সম্পদ ও মর্যাদার দ্বারা। হযরত সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র ইজ্জত, মর্তবা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের প্রশাসনী প্রভাব ও প্রতিপত্তি হিংসাতুর করে তুলেছিল তাদের বুদ্ধির ও আত্মার নীচুতাকে। ফলে ঐ লোকগুলো মনে করে নিয়ে ছিল যে, সাহাবাদেরকে প্রশাসন থেকে সরাতে না পারলে তাদের মনোবাঞ্ছা অর্থাৎ তাদের দুনিয়াবী উন্নতি ও পয়সার লালচ অপূর্ণ থেকে যাবে।

এই ফেৎনার প্রধানতম কারণ ছিল, সম্ভবতঃ খেলাফৎ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা। তাদের অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে, খেলাফৎ ও খেলাফতের পদ্ধতি এবং পার্থিব প্রশাসন ও পার্থিব প্রশাসনের পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করতো যে, পার্থিব প্রশাসনের ন্যায় খেলাফতের হুকুমাতেও সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ অপরিহার্য এবং সর্বক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। খিলাফৎ সম্পর্কে এই ধারণা বিলকুল বাতেল ও উদ্ভট। ইসলামের খেলাফৎ একটি ঐশী প্রতিষ্ঠান, এবং তা সাবিকরূপেই। বিদ্রোহীদের হীনতম দাবীর উত্তরে হযরত খলীফাতুর রসুল ছালেছ বলেছিলেন যে, খেলাফতের যে পিরহান খোদাতায়ালা আমাকে পরিয়েছেন, তা খুলে ফেলার সাধ্য আমার নেই। হাজীদের কাছে লিখিত পত্রটিতে সুরা নূরের আয়াতে ইস্তেখলাফের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, খলীফাকে খোদাই নিযুক্ত করেন – খলীফা খোদা বানাতা হ্যায়। তিনি বলেছিলেন যে, এই সকল লোক যদি আমাকে কেটে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে তথাপি খেলাফৎ থেকে মা'জুল হওয়া বা পৃথক হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সে অধিকার খলীফার নয়, খোদার এখতিয়ারে। খেলাফতের দায়িত্ব একবার যার স্কন্ধে ন্যস্ত হয়, তিনি আজীবন সে দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যই পার্থিব হুকুমাত থেকে খেলাফতের নেজামকে স্বতন্ত্র রেখেছে। সাইয়েদেনা খলীফাতুল মসীহ ছালেছ (আইঃ) তাঁর লণ্ডন বক্তৃতার প্রারম্ভেই খেলাফতের এই বিশেষ বিশেষত্বটির উল্লেখ করেছেন। তাঁর পবিত্র জবানে ঃ—"আহমদীয়া জামাতের নেতা হিসাবে আমি এক আধ্যাত্মিক পদে অধিষ্ঠিত। যতক্ষণ না আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুহূর্তেই আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্বভার ত্যাগ করবার অধিকার আমার নেই। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে বিশ্ব-মানবমণ্ডলীর প্রত্যেকটি মানুষই আমার এই দায়িত্বের আওতাভুক্ত।"

ইহুদী 'ইবনে সাবা' সেদিন তার সেই প্রচণ্ড

শয়তানী শুরু করেছিল প্রথমে খলীফার বিরুদ্ধে নয়, আমীরের বিরুদ্ধে। ফাছাদকারীরা সবাইকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল—এবং অনেককে করায়েছিলও—যে, খেলাফৎ বা খলীফার বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ নেই; স্থানীয় আমীর অযোগ্য, তার পরিবর্তনই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু ইতিহাস জানে, কী ভয়াবহ জুলুমই না তারা সেদিন করে গেছে। শয়তানীয়াতের এমন কোনো হদ নেই যা তারা লঙ্ঘন করেনি। তারা মদীনা শরীফ অবরোধ করেছে। মদীনাবাসী নির্দোষ মুমিনদের উপরে অত্যাচার করেছে। তারা হুজুর আকরাম (ছঃ)-এর ঐতিহ্যবাহী লাঠি মুবারক ভেঙ্গে টুকরো করে ফেলেছে। মসজিদে নববীতে খঞ্জর মেরেছে,—খঞ্জর মেরে জখম করেছে খলীফাকে—জখম করেছে অন্যান্য সাহাবীকে। তারা খলীফার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। ষড়যন্ত্র করেছে—বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। তারা হযরত ওসমানকে খেলাফৎ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য ভয়ংকর দাবী তুলেছে। তারা হযরত আলীসহ সকল বুজুর্গ সাহাবায়ে কেরামের (রাজিঃ) বিরুদ্ধে গীবৎ করেছে। তাঁদের নসীহত অগ্রাহ্য করেছে। তাঁরা উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে হাবীবাকে (রাঃ) লাঞ্ছিত করেছে, তাঁকে গঞ্জনা দিয়েছে। তারা উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তারা খলীফার বাসগৃহে পাথর ফিঁকেছে—হামলা চালিয়েছে। তারা খলীফার নসীহত অগ্রাহ্য করেছে তাঁর মর্মস্পর্শী আবেদন উপেক্ষা করেছে। তারা বুজুর্গানে দীন সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) সঙ্গে লড়াই করেছে—তারা কী না করেছে? পরিশেষে, তারা হযরত খলীফাতুর রসুল ছালেছকে (রাঃ) কতল করে তাদের মনস্তুষ্টি সাধিত করেছে।

ইসলামী খেলাফতে খলীফা তো দূরস্থান, কোনো আমীরের বিরুদ্ধও তথাকথিত বিক্ষোভ প্রদর্শনের কোনো স্থান নেই। এই সত্যটা হযরত ওসমানের (রাঃ) আমলের নও মুসলমানরা জানতে না। এবং জানতো না বলেই তাদের অজ্ঞানতার সুযোগ গ্রহণ করেছিল ইবনে সাবা। অন্যান্য সকল কারণের মধ্যে এটাই ছিল সেদিনের ফেৎনার সবচে দুঃখবহ এবং সবচে মারাত্মক কারণ। কিন্তু আজও সরলপ্রাণ মুসলমানদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই খেলাফৎকে এমনভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেতে চান যেন খেলাফৎ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা দুনিয়াবী নেজাম। মওলানা মওদুদী তাঁর 'দি ইসলামীক ল' এ্যাণ্ড কনষ্টিটিউশন, পুস্তকে আয়াতে ইস্তেখলাফের উদ্ধৃতি দিয়েও বলেছেন, "পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে সরকার প্রতিষ্ঠিত কিংবা পরিচালিত হয় সাধারণ ভোটারদের দ্বারা। আমাদের গণতন্ত্রেও তাই হবে।" ইসলামী খেলাফতের ব্যাখ্যায় মওদুদী সাহেব বলেই ফেলেছেন, "রাষ্ট্রই খোদাতায়ালার প্রতিনিধি।" (পৃষ্ঠা ২৩৫, ২৩৬)।

আফ্‌ছুছ! হুজুর আকরামের (সাঃ) উম্মতের বরং তাঁর নায়েবীর দাবীদার ব্যক্তিগুলোই এই সকল বিপদজনক ধারণাকে কোরআণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন নির্দ্বিধায়। অথচ সেদিন সাহাবায়ে কেরাম খেলাফতের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রকে সংযুক্ত রেখেছিলেন মজবুর হয়েই। এছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। কিন্তু আজও যারা খেলাফৎকে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র বলে মনে করে নেন, তাঁদের মহান লক্ষ্য খোদা নন—পরন্তু শক্তি ও সম্পদ। এমনি শক্তি ও সম্পদের বিপ্লবী লালচে মোসলেম নামক একটি নাপাক আত্মা সেদিন রসুলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পর্যন্ত বলতে পেরেছিলো, "হে আল্লার রসুল, আল্লার প্রতি তাকওয়ার সঙ্গে কাজ করুন।' কী সংগ্রামী ধৃষ্টতা! পরে রসুল করীম (সাঃ) এই ইতর উদ্ধত লোকটার সম্পর্কে বলেছিলেন "এই ব্যক্তির ঔরস থেকে এমন একটা জাতের সৃষ্টি হবে, যারা কোরআন করীম যথেষ্ট পড়বে, কিন্তু তা তাদের গলার

নীচে যাবে না। এবং তারা ধর্ম থেকে এত দ্রুত ভেগে যাবে, যেমন ধনু থেকে তীর ভেগে যায়।" (বোখারী শরীফের এই হাদিসটি উদ্ধৃত করা আছে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানির (রাঃ) লিখিত 'ইসলাম মে ইখতেলাফাৎ কা আগাজ' পুস্তক। এই পুস্তকটিতে হযরত ওসমানের খেলাফৎ ও তাঁর শাহাদৎ সম্পর্কিত যাবতীয় বিভ্রান্তির অপনোদন করা আছে।)

অধুনা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারণামুগ্ধ' অনেকেই মনে করে থাকেন যে, ইসলামেও খলীফা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন বা হবেন, এবং প্রয়োজন হলে তাকে জনসাধারণের ভোটেই অপসারণ করা যাবে। এক্ষেত্রে তাঁরা ভুল করেন বা ভুলে যান যে, আল্ কোরআন খোদাতায়ালা নিজেই খলীফা বানাবার কথা বলেছেন। এ ছাড়া, খলীফা মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হলেও এ নির্বাচনের ভোটাররা সাধারণ নির্বাচনের ভোটারদের থেকে স্বতন্ত্র। এঁরা মুমিন। আর এখানেই গোটা ব্যাপারটার তাৎপর্য নিহিত। মুমিনের ইচ্ছা—অভিলাষ খোদার ইচ্ছার পরিপন্থী হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালা তাঁর ইচ্ছাকে মোমেনদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করে থাকেন। এই সত্যটিকে আমরা প্রত্যেক খলীফার এবং বিশেষভাবে খলীফাতুল মসীহ্ সানির (রাঃ) নির্বাচনে প্রত্যক্ষ করেছি।

মুমিনরা যেহেতু খোদাতায়ালার কাছে সর্বতোভাবে সমর্পিত, সেহেতু খলীফা একবার নির্বাচিত হলে সারা জীবনের জন্যই হয়ে থাকেন। কারণ, আল্লাহতায়ালার কাছে একবার আত্মসমর্পণ, আর একবার তার পরিবর্তন বা প্রত্যাহারের নাম ইমান নয়। অনেকে—মওদুদীরাও 'আমীর' শব্দটিকে 'খলীফা' শব্দের সমার্থক মনে করেন। ফলে তাঁরা আমীরুল মুমেনীন ও খলীফাতুল্লাহ্ এই দুইটি অবস্থাকে একই সত্তার একটিমাত্র গুণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তারা ভুলে যান যে, খলীফা আমীরুল মুমেনীন তো বটেই, খলীফাতুল্লাহ্ও বটেন। এক্ষেত্রে তাঁর মুমিনদের নেতৃত্ব অবরোহী এবং খোদা তায়ালার প্রতিভূত্ব আরোহী। তাঁর এই আরোহীর সোপান তাঁর পূর্ববর্তী নবী বা রসুল। এ কারণেই 'কুদরতে সানিয়া বা খেলাফৎ 'আলা মীনহাজীন নবুওৎ' এর সেলসেলাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, এবং হয়েছেও তাই। খলীফা খোদার পথে মানুষের মাধ্যম। সুতরাং একবার নির্বাচিত হলে তাঁর পক্ষে সরে দাঁড়াবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। অপরপক্ষে, মুমিনদের কেউ খলীফা থেকে তাঁর আনুগত্য প্রত্যাহার করতে পারেন না! করলে তিনি আর মুমিন থাকেন না।

খেলাফৎকে সরাসরি 'রাষ্ট্র' বলে নিয়ে মওদুদী সাহেব খেলাফতের আধ্যাত্মিকতাকে স্বীয় কলমের খড়্গাঘাতে বিচ্ছিন্ন করে তাকে তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে সমাধিস্থ করতে চেয়েছেন অথচ আধ্যাত্মিক রূপটাই খেলাফতের মূল, আসল, প্রধান এবং সাবিক। খেলাফৎ থেকে রুহানীয়াতকে লুপ্ত করে দেওয়ার অপচেষ্টা যে মুমিনদের কাছে কত বড় ভয়ানক ও কত বড় মর্মন্তুদ তা মওদুদীরা কখনও উপলব্ধি করতে পারবেন কিনা জানি না। তবে, তাঁদের এবং তাঁদের মত অনেকেরই অনুরূপ বিপ্লবী বুদ্ধির ফলেই সম্ভবতঃ দুনিয়ার মুসলমানরা আজ আধুনিক ও আদিম ইহুদীদের কাছে বার বার মার খাচ্ছে। মনে রাখা ভাল যে, জ্ঞানের রাজ্যে গণতন্ত্র অচল। ভোট দিয়ে জ্ঞানী বানানো যায় না, গুনী বানানো যায় না। জ্ঞানের রাজ্যে গুণতির দাম নেই। শতকরা একানব্বইজন যদি ভুল ও করে, গণতন্ত্র সেই ভুলের পক্ষেই রায় দান করবে। হেন গণতন্ত্র ইসলামে অবান্তর। কেননা ইসলামের ভিত্তি জ্ঞান। এ কারণে অগণিত ফেরেশতার ভোটের বা মতের বিরুদ্ধে খোদাতায়ালা তাঁর এক ভোটেই হযরত আদম (আঃ)-কে তাঁর জনগনের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন। এবং "আমি যা' জানি তোমরা তা' জান না"—বলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে—জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইসলামে সার্বভৌমত্বের অধিকারী মানুষ নয়—সেখানে সার্বভৌমত্ব খোদাতায়ালার একতিয়ারে। এ জন্যই খোদা তায়ালার প্রতিভূ,—খলিফা—শূরার রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও শূরার রায় তার পরে' বাধ্যকর নয়। খোদাতায়ালার খলীফা পরিচালিত হন জনগনের মতামত দ্বারা নয়, খোদাদত্ত জ্ঞানের

দ্বারা। এ জ্ঞানের কল্যাণেই তিনি যে কোনো রায়ের যাথার্থ্য নিরূপনে যোগ্যতম। এবং এ কারণেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল দায়িত্বও তাঁরই। খোদা তাঁর দ্বারা এমন কিছু ঘটান না, যার ফলে জামাতের ক্ষতিসাধন হতে পারে। এই জন্য আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে যা' খলীফার ইজ্‌তেহাদি গলতি (?) বলে অনুমিত হয়, তা' আসলে ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক। তার যাথার্থ্য নির্নীত হয়ে থাকে আগামীতে। এবং এই আগামীর খবরটা জানেন আলেমুল গায়েব, এবং আর তাঁরই অনুকম্পায় জানতে পারেন তাঁর খলীফা। ইমানদারীর ফলটা হাতে হাতে না পেলে যাঁরা সবুর করতে পারেন না, তাঁরাই কি ডেকে আনেন নি ওহোদের বিপর্যয় ?

সাইয়েদেনা হযরত খলীফাতুল মসীহ ছালেছ (আইঃ) তাঁর ঐতিহাসিক আফ্রিকা সফরের সময় সুরুলিয়ারের (লাগোস) মুসলিম টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হলে একটি ভাষণ দান করেছিলেন। ভাষণটি ছিল জুমআর খোৎবা। হুজুর (আইঃ) এই খোতবায় মানবীয় সংগঠন এবং খেলাফতের নেজামের মধ্যকার পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে ব্যক্ত করেন। তাঁর পবিত্র জবানেঃ

"মানব-গঠিত একটা সমিতির অর্থ হচ্ছে, তার সদস্যরা একটা সাধারণ উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্যে একমত হয়ে থাকেন। কিন্তু, খোদাতায়ালার প্রতিষ্ঠিত একটি জামাত এবং একটি সমিতির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। এটা কোনো ক্লাব নয়। ইহা এমন একটি জামাত যার প্রতিষ্ঠা করেন খোদাতায়ালা তাঁর নিজ হাতে, তাঁর সকল আশীস ও কল্যাণ দিয়ে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছেঃ কিছু সংখ্যক মানুষ একত্রিত হয়ে কোনো সংঘ গঠন করলে সেই সংঘকে ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকারও তাদের থাকে। পক্ষান্তরে খোদা কোনো জামাত গঠন করলে, পৃথিবীর বুকে এমন কোনো এজেন্সী থাকে না, যা সেই জামাতকে ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা রাখে।

"মানুষের দ্বারা সংগঠিত কোনো সমিতি দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হতে পারে বা হয়। এবং প্রতিটি উপদলের অধিকার ও সুবিধা অপরাপর উপদল গুলোর তুলনায় সমান সমান হয়ে থাকে। আল্লার প্রতিষ্ঠিত জামাতের মধ্যেও বিভাগ দেখা দিতে পারে; তবে তার মধ্যে একটিমাত্র ভাগই আল্লাহ্‌তায়ালার আশীষ ও অনুগ্রহের অধিকারী হয়ে থাকে। অন্য বাকী দলগুলো খোদার আশীষ থেকে বঞ্চিত থাকে।

"মানুষের সংগঠিত সমিতির ক্ষমতা তার সদস্যবৃন্দের পার্থিব কল্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।.....খোদায়ী জামাতের আসল উদ্দেশ্য—এর সদস্যবৃন্দকে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া।"

হুজুর (আইঃ) আরও বলেন ঃ "খলীফা মানব-সংগঠিত কোনো সংঘের নেতা নন। তিনি খোদা কতৃক পছন্দকৃত এবং খোদার উপকরণ (Instrument)। তিনি ঐশী উদ্দেশ্যকে পেশ করেন এবং তার রূপদান করেন। খেলাফৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থই খোদায়ী পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।"

আরম্ভে উল্লেখিত হযরত মসীহ মওউদের (আঃ) ভবিষ্যৎ-বাণীতে হুঁশিয়ারী দেওয়া আছে যে, তাঁর মওউদ পুত্রের আমলে অনেকেই জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এবং উপরে সেই মওউদ পুত্রের যে বাণী উদ্ধার করা গেল, সেখানেও সেই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধেই হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে বলা যায়।

সুতরাং বিচ্ছিন্নতা কেবল ১৯৫৬ সালের 'বায়াতুর রেদওয়ান' বা ১৯১৪ সালের 'আলী-কামালী' ফেৎনার দাফনের মধ্য দিয়েই সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে, এমন কথা মেনে নেওয়া যায় না। বর্তমান খেলাফতে ছালেছার আমলেও ফেতনার সৃষ্টি হওয়া এবং তজ্জনিত বিচ্ছিন্ন হওয়ারও সমূহ আশংকা রয়েছে। এবং বলা যায় যে, ফেৎনার সৃষ্টি হবে এবং অনেক বদ-নসীবও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যেমন হয়েছিল হযরত খলীফাতুর রসুল ছালেছের (রাজিঃ) আমলে। স্মর্তব্য যে, সেযুগে ফেৎনার সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রথমেই খলীফার বিরুদ্ধে নয়—স্থানীয় আমীরের বিরুদ্ধে। এবং ফেৎনাবাজদের এই কৌশলের শিকারে পরিণত হয়েছিল অনেক নবীন ও অবুঝ মুছলমান। (ক্রমশঃ)

সংবাদ—

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে—

বিভিন্ন স্থানে সিরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত

ঢাকা ঃ

বিগত ২৭শে এপ্রিল ঢাকায় দারুত তবলীগ মসজিদে স্থানীয় আঞ্জুমনে আহমদীয়ার উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে সিরাতুন্নবী (দঃ) জলসার আয়োজন করা হয়েছিল। এই মহতী জলসায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানের আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব। সভায় মৌলবী হেলাল উদ্দীন সাহেব কর্তৃক কোরআন পাক তেলাওতের পর একটি নজম আবৃত্তি করে শোনান জনাব সোলায়মান হোসেন।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় সদর মুরুব্বী মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব বলেন যে, হযরত রসুলে করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শই মানবজাতির সম্মুখে একমাত্র জীবন্ত এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। কেবলমাত্র সেই অদর্শের যথাযথ অনুসরণই মানুষকে খোদা—তায়ালার সন্নিধ্যে পৌঁছাইতে পারে। তিনি বলেন, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সেই মহান আদর্শের জীবন্ত প্রতিচ্ছায়া। বর্তমান জামানায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হযরত রসুলুল্লার রঙে রঙিন হয়ে জীবন্ত ইসলামের যে বীজ রোপন করে গেছেন তাই একদিন সুবিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। এবং সেদিন অত্যাসন্ন। জনাব মৌলবী মোস্তফা আলী তাঁর বক্তৃতায় বলেন। আমাদের দেশের বর্তমান সামগ্রিক বিশৃংখল পরিস্থিতিতে মানব চরিত্র বিশেষ করে যুবকদের চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। এবং সেজন্য যে আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন সেই দৃষ্টান্ত হচ্ছেন রহমতুল-লীল আলামীন (দঃ)। জনাব আলী নানা ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, ইসলামের শাসনে মানবজাতি যে সর্বাধিক নিরাপত্তা লাভ করতে পারে তার প্রমাণ রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) শাসনামল। শাহ্ মুস্তাফীজুর রহমান তার ভাষণে বলেন যে, মানব সৃষ্টির পর খোদাতায়ালা মানবের কল্যাণের জন্য তাঁর দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি পাঠানোর যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তার নাম নবুওত। মানবতার পূর্ণতম রূপায়নদান পূর্ণতম নবীর মাধ্যমেই সম্ভব এজন্য খোদাতায়ালা তাঁর পূর্বপরিকল্পনামত পৃথিবীর বুকে পূর্ণতম নবী প্রেরণ করেন। পূর্ণতম যেহেতু একের অধিক হয় না, যেহেতু মানুষের জন্য খোদাতায়ালার মায়া-মহব্বতের স্রোত রুদ্ধ হতে পারে না; সেহেতু পূর্ণতম নবুওতের একক প্রবাহেই মানুষের মধ্যে নবী আসতে হবে। কারণ পূর্ববর্তী প্রবাহ সমূহ মহানবীর (সাঃ) মহাপ্রবাহে মিলিত হয়ে ছুটে চলেছে খোদা-প্রেমের মহা-সাগরে। এই অর্থেই মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ (দঃ) খাতামান নবীঈন এবং মানবতার একক ত্রাণকর্তা। এবং হযরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) সেই মহা প্রবাহের চিরপ্রবাহমানতার মহাপ্রমান। এই অর্থেই তিনি মসীহ মাহদী—উম্মতি নবীও। জনাব মকবুল আহমদ খান তাঁর বক্তৃতায় রসুলে করীম (দঃ)-এর জীবনের প্রথম অংশের প্রতি আলোকপাত করে বলেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) সুখে দুঃখে জীবনের প্রতিটী ক্ষেত্রে যেভাবে যে পন্থায় সফলতা লাভ করে গেছেন, আজকের দুনিয়ায় মানুষ যদি সেই উপায়ের—সেই পন্থার অনুসরণ করে চলতে পারে তবে তারা তাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে

পৌঁছতে সক্ষম হবে। ভিন্নতর কোনো পন্থাতেই মানুষের চির-আকাংখিত সুখ ও শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। জনাব বদরুদ্দীন আহমদ এডভোকেট বলেন যে রসূলে করীম (দঃ) এর জন্মগ্রহণের প্রায় দেড় হাজার বছর পরে সারা দুনিয়া জুড়ে যে পূত-পবিত্র পরিবেশে হৃদয়-মেশানো শান শওকতের সঙ্গে তাঁর জীবনী আলোচিত হচ্ছে—তাঁর পূণ্যময় পবিত্রতম আত্মা এবং তাঁর আহলে বায়তের উপরে যে অসংখ্য দরূদ ও ছালাম পাঠ করা হচ্ছে – তাই প্রমাণ করতে যথেষ্ঠ যে, হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ) বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন পয়গম্বর। জলসায় 'সত্যের জনক' শীর্ষক একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান বাংলাদেশ সরকারের সহকারী একাউন্ট্যান্ট জেনারেল জনাব মুহম্মদ খলীলুর রহমান। সভাপতির ভাষণে জনাব আমীর সাহেব একটি রুহানী ভাষনে সবাইকে সর্বক্ষণ দোয়ারে রত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, হযরত রসুলে করীমের (দঃ) জীবনের সর্বক্ষেত্রের সাফল্যের সর্ব-প্রধান উপকরণ ছিল দোয়া। আজও আহমদী জামাতের হাতে পার্থিব উপকরণ বলতে কিছুই নেই – থাকারও কথা নয়। সুতরাং প্রতিটি আহমদীর কর্তব্য বিগলিত প্রাণে রহমানুর রহীমের দরগায় দিবারাত্র দোয়ায় রত থাক। এবং এটনি হলে, তিনি দৃঢ় আশা ব্যক্ত করে ঘোষণা করেন যে, সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালা এ পথেই আহমদীয়াতের বিজয় সুনিশ্চিত করে তুলবেন। ইহাই খোদাতায়ালার এরাদা। আর খোদাতায়ালার এরাদাকে প্রতিহত করে এমন শক্তি দুনিয়াতে নাই। অতঃপর তিনি দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত করেন। সভাশেষে সবাইকে মিষ্টিমুখ করা হয়।

চট্টগ্রাম

৭ই জুন চট্টগ্রাম মসজিদ আহমদীয়ার প্রাঙ্গণে স্থানীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে একটি অত্যন্ত বাবরকত ও সাফল্যজনক সিরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই আকর্ষণীয় জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আঞ্জুমনের প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহ্‌মদ খাঁ সাহেব। সভায় জনাব কমরুল ইসলাম কর্তৃক কোরআন্ পাক তেলাওতের পর এক ঘন্টা ব্যাপী একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাকা হইতে আগত সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ। তিনি বলেন, সর্বকালের মানবের জন্য পূর্ণতম সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরসজীব এবং জীবন্ত আদর্শ বিধৃত রহিয়াছে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র ও মহান জীবনীতে। তাঁহার আদর্শ যেমন আরব পশুতুল্য বর্বর জাতীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষের চরম শিখরে উপনীত করিয়াছিল তেমনিভাবে উহার এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যকরী প্রভাব চিরকালের জন্য অক্ষর ও অব্যয় রহিয়াছে। এই ধারাবাহিকতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দেওয়ার জন্যই হযরত মসিহ মাওউদ-ইমাম মাহদী (আঃ)-এর এযুগে আবির্ভাব হইয়াছে। অতঃপর ময়মনসিংহ হইতে আগত আল-হাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী তাঁর এক ঘন্টাকাল ব্যাপী আকর্ষণীয় ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় বলেন যে আজকাল অনেকেই বলে থাকেন যে, এযুগে ধর্মের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে, কেননা মানুষ ক্রমশঃ ধর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইতেছে। তিনি এর জবাব দিতে যাইয়া বলেন, যে, ধর্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। কেননা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, ধর্মের উপর যখনই আঘাত আসিয়াছে, তখনই ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছে।

অতএব, বর্তমান যুগেও মহানবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সত্য ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের নবউত্থান হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক ইহাও বলে থাকেন যে, চৌদ্দশত

বৎসর পূর্বের কোন ব্যক্তির জীবন চরিত আলোচনা করার কোন সার্থকতা নাই। কেননা বর্ত্তমান সমাজ ও তার সমস্যা সেই যুগ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন, এই প্রশ্নটিও সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রসূত। কেননা চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে যে অন্যায় অবিচার এই পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইত তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী বর্ত্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, মহানবী (সাঃ)-এর প্রয়োজন ও পূর্বেকার চাইতে বহুগুণে অধিক। 'মানব ধর্ম-ই একমাত্র ধর্ম' বলে যারা বড় বড় বুলি আওড়ান, তিনি তাহাদের জবাব দিতে গিয়া বলেন যে, একথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে মানব ধর্ম বলিতে কি বুঝায় এবং কোন্ মানবের মধ্যে তার বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে, তাহাও আমাদিগকে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ মানব একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। মানবের সকল প্রশংসনীয় স্তরের সমন্বয়ে মোহাম্মদের (সাঃ) সৃষ্টি হইয়াছে। তাই মোহাম্মদ অর্থই প্রসংশিত। তিনি বলেন, মানব ধর্মের তথা-কথিত প্রবক্তাদের কলেমা "সভার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" ষোল আনাই ভ্রান্ত। কেননা ইসলাম বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা বা সবার উপর আল্লাহ সত্য, তাঁহার উপরে নাই। যাহারা বলেন, বিগত দিনগুলিতে ইসলামের যে রূপ মোল্লা সম্প্রদায় দেখাইয়াছেন উহার পর আর ইসলামের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে, ইহা ইসলামের নবীর সত্যতাই প্রমাণ করিতেছে। কেননা তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়া-ছিলেন যে, ইসলামের মাত্র নাম অবশিষ্ট থাকিবে এবং উলামা আকাশের নীচে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হইবে। বিগত দিনে তাহা পূর্ণ হইয়া নাস্তিকদিগের সম্মুখে আল্লাহ ও রসুলের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় তুলিয়া ধরিয়াছে। অতপর খাদ্য না থাকিলে ধর্মকর্ম করা যায় না বলিয়া যাহারা বলে তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া বলেন যে ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। রসুল করীম (সঃ) ও তাঁহার সাহাবা অনাহারে থাকিয়াও ধর্মকর্ম করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জ ঃ

বিগত ৩রা মে ১৯৭২ ইং বাদনামাজ আসর আঞ্জুমনে আহমদীয়া, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে স্থানীয় জমাতের মসজিদে সিরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মোহতারাম আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব। কোরআন তেলাওয়াতের পর হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর মহান পবিত্র জীবনীর বিভিন্ন দিক আলোক-পাত করিয়া বক্তৃতা করেন জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব, শহীদুল ইসলাম সাহেব এবং মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী। অতঃপর মাননীয় সভাপতি সাহেব তাঁহার অত্যন্ত আকর্ষণীয় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় বলেন, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনের ছত্রে ছত্রে এবং তাঁহার চরিত্রের অঙ্গে অঙ্গে অনুপমতা, শ্রেষ্ঠতা সার্বিকতা ও বৈশিষ্ঠতার মোহর অঙ্কিত রহিয়াছে। একমাত্র তাঁহারই আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ ও অনুকরণ যোগ্য। কোনো খাঁটি মুসলমানের জন্য কি ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, সে পূর্ণ আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া জগতের অপর কোন পথ প্রদর্শক বা বিধানের সহিত সংযুক্ত হওয়াকে গৌরবের মনে করিবে? এক খাঁটি মুসলমান একমাত্র রসুল করীম (সাঃ)-এর গোলামী করার মধ্যে গৌরব অনুভব করিতে পারে। কেননা সর্ব-কালের সমস্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ইসলামী সাম্যে এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর আদর্শের অনুগমণের

মধ্যে রহিয়াছে। দুনিয়ার কোন ইজম বা বিধান আজ জগতকে শান্তি দিতে পারে না একমাত্র তাঁহার অনুগমণই জগতকে উদ্ধার করিতে পারে। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি, তিনি যেন তাঁহার বান্দাগণকে সুমতি দেন এবং তাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুগমণ করিয়া ধ্বংস, দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি হইতে বাঁচিয়া যায়। আমীন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

বিগত ৯ই মে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া সহরের তোফায়েল আজম রোডে বাদ মাগরিব সিরাতুন্নবীর এক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব গোলাম সানদানী এডভোকেট। মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী বর্তমান যুগ ও মহানবী (দঃ) বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রায় হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। সভাশেষে জনাব ফরিদ আহমদের পক্ষ থেকে উপস্থিতদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

তেমনিভাবে ২৭শে এপ্রিল আহামদী পাড়ায় মসজীদ মোবারকের প্রাঙ্গনে বাদ আসর সিরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তেলাওত ও নজম পাঠের পর হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়া বিশদ আলোচনা করেন সদর মুরুব্বী মৌলানা সৈয়দ এজায আহমদ সাহেব ও জিলা কায়েদ জনাব মোহাম্মদ ইদ্রীস সাহেব এবং আরও কয়েকজন খোদ্দাম। অতঃপর সভাপতির ভাষণ ও সম্মিলিত দোয়ার সহিত সভার কাজ সুসম্পন্ন হয়।

ময়মনসিংহ ঃ

বিগত ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল ৯ ঘটিকায় ময়মনসিংহ সহরের মুকুল ফৌজ মিলনায়তনে নবী দিবস উপলক্ষে এক আকর্ষণীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা আহমদী এবং গয়ের আহমদীদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। সর্ব সম্মতিক্রমে জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে সহরের বুদ্ধিজীবিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি পূর্বাহ্নেই গঠিত হয়েছিল।

উক্ত সভায় কৃষি বিশ্বালয়ের উপচার্য ডক্টর কাজী ফজলুর রহিম সভাপতিত্ব করেন। জনাব আমির হোসেন-এর প্রবন্ধ পাঠের পর যথাক্রমে শ্রী আশু তোষপাল, রেভাঃ আই, হোলী, এডভোকেট বঙ্কীম চন্দ্র দে, অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী, অধ্যাপক আজিজুল হক চৌধুরী ও আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী বক্তৃতা প্রদান করেন। দীর্ঘ চার ঘন্টা পর্যন্ত এই সভার কাজ চলে। উল্লেখযোগ্য যে, সকল ধর্মের প্রতিনিধির অংশ গ্রহণে এ ধরণের সিরাতুন্নবীর জলসা ময়মনসিংহে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল।

আহমদ নগর (দিনাজপুর)

গত ১২ই রবিউল আউয়াল ২৭শে এপ্রিল তারিখে আহমদ নগর 'দারুল মসিহ' এর জুমা মসজিদে মিলাদুন্নবী দিবস প্রতিপালিত হয়। সন্ধ্যা ৮ টায় মসজিদ প্রাঙ্গনে বহু ভাই উপস্থিত থাকেন। রসুল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণের উপর আলোকপাত করেন জনাব মৌঃ মনাওয়ার আলী, মৌঃ ইছমাইল বোখারী, মোঃ তাহের এবং জনাব যাহেদুর রহমান। হাদীছ পাঠ করেন মৌঃ শরীফ আহমদ ও নজম পাঠ করেন গোলাম আহমদ। দোয়ার পর মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

ঢাকা লাজনা আমাউল্লাহর উদ্যোগে ঃ

গত ২৮শে এপ্রিল রোজ শুক্রবার ঢাকা দারুত তাবলীগে মসজিদে লাজনা আমাউল্লার তরফ হইতে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে বাদ জুম্মা একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন লাজনা সভাপতি বেগম আলহাজ আবদুস ছালাম। এই সভায় কোরান তেলাওত করেন মিসেস সদেকা হক। হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) এর কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনান লাজনা আমাউল্লার সেক্রেটারী বেগম ডাঃ আবদুস সামাদ। অতঃপর তিনি হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর জীবনের বহু মূল্যবান ঘটনার আলোচনা করে

এক ভাষণ দান করেন। হযরত রসুলে করীম (সঃ) এর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের ছোট ছোট বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করেন লাজনা সভাপতি। মানব সভ্যতায় হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দান সম্পর্কে বলেন মিস হোসনে আরা বেগম। দেশের বর্তমান অবস্থায় রসুলুল্লার (সঃ) আদর্শের অনুসরণের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দান করেন মিসেস সাদেকা হক। সভায় ঈদে মিলাদুন্নবী গজল আবৃত্তি করে শোনানো হয়। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করা হয়।

বয়েত

আল্লাহ তায়লার ফজলে চুয়াডাঙ্গা কলেজের দুইজন অধ্যাপক কমরুদ্দীন খান ও অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তাঁদের পরিবার সহ বয়েত করে পবিত্র সিল-সিলায় দাখেল হয়েছেন। এঁরা সকলেই অধ্যাপক আবু খালেদ সাহেবের তবলীগে আহমদী হয়েছেন।

বিগত কিছুদিনের মধ্যে সুন্দর বন জামাতে ৬৫ জন বয়েত করেছেন। ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কিছু বয়েত হয়েছে।

বন্ধুগণ, এঁদের এস্তেকামাতের জন্য বিশেষ দোয়া জারী রাখিবেন।

একটি বিজ্ঞপ্তি

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদীয়া আন্ত মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংস্থার (Ahmadiyya Inter Collegiate Association B. Baria) পক্ষ হইতে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করার মনস্থ করা হইয়াছে। এই বার্ষিকীতে ধর্ম ও শিক্ষামূলক প্রবন্ধ কবিতা প্রভৃতি প্রকাশ করা হইবে। আগামী ২৪শে জুনের মধ্যে লেখা পাঠাবার জন্য সকলকেই বিশেষতঃ আহমদী কলেজ ছাত্রদেরকে অনুরোধ করা যাইতেছে। লেখা পাঠাবার ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হলো।

জাফর আহমদ চৌধুরী
রহিম মহল
মধ্যপাড়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

পূর্ব্বঘোষণা অনুযায়ী বিগত ১৪ই মে দারুত তবলীগ ঢাকায় বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অত্যন্ত শৃঙ্খলা ও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এই বারকত সম্মেলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সুন্দরবন ইত্যাদি ১৪টী মজলিস হইতে ৪০ জন কায়েদ ও নোমায়েন্দাগণ অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব দোয়া করিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের এজেণ্ডা অনুযায়ী বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সংবিধান বা দসতুরে আসাসী adopt করা হয়। অতঃপর উহাতে লিপিবদ্ধ বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার দেশীয় প্রধান বা 'সাদরে মুলক'-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য সর্বাধিক ভোটে অস্থায়ী প্রধান জনাব খলিলুর রহমান সাহেব সাদ্‌রে মুলক বা দেশীয় খোদ্দাম প্রধান নির্বাচিত হন। অতঃপর হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেসের (আইঃ) প্রতিনিধি বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর সাহেব তাহার অনুমোদন প্রদান করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা মোবারক করুন। আমীন। নির্বাচন সভার কাজ পরিচালনা করেন ভূতপূর্ব রিজনেল কায়েদ জনাব আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী। সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে পরে প্রকাশিত হইবে।

• চাঁদা প্রদানকারী আঞ্জুমান সমূহের নাম

বিগত মালী সালে (১৯৭১-৭২) এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিম্নলিখিত আঞ্জুমন সমূহ হইতে লাজেমী ও অন্যান্য খাতে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। জযাহুল্লাহ্‌ তায়ালা।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রেকাবী বাজার, তেজাগাঁও, ময়মনসিংহ, ধানীখোলা, বরিশাল, রংপুর, মাহিগঞ্জ, বগুড়া, কুষ্টিয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তারুয়া, দুর্গারামপুর, ঘাটুরা, শরাইল, কুমিল্লা, চরদুখিয়া, বিরপাইকসা, চিটাগাং, সিলেট, তেরোগাতি।

খুলনা, জামালপুর, তাতারকান্দী, সুন্দরবন, চুয়াডাঙ্গা, উথলী, মুন্সিগঞ্জ, দোহাওা, আহমদনগর, কাফুরা, রাজশাহী, কোটিয়াদী, ভেড়ামারা।

সহকারী সেক্রেটারী মাল
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
ঢাকা।

* লণ্ডন, ২১শে শাহাদত (এপ্রিল) হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহর ফজলে ভাল আছে। আলহামদু লিল্লাহ। বন্ধুগণ, হুজুর (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য সর্বান্তকরণে দোয়া জারী রাখুন।

* কাদিয়ান, ৭ই হিজরত (মে): মোহ্‌তারাম সাহেবজাদা মির্যা ওয়াসিম আহ্‌মদ সাহেব, হযরত মওলানা আবদুর রহমান সাহেব, আমীর কাদিয়ান শরীফ এবং সেখানকার সকল দরবেশ সাহেবান আল্লাহ্‌র ফজলে ভাল আছেন। বন্ধুগণ, সকলের জন্য দোয়া জারী রাখিবেন। (সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান) ভারত।)

শোক সংবাদ

* অত্যন্ত দুঃখের সহিত বন্ধুদের জানান যাইতেছে যে, জনাব চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, মোয়াল্লেম ওক্‌ফে জাদীদ, ঢাকা বিগত ২৩শে মে বেলা দেড় ঘটিকায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহে.....। দুই দিন পূর্বে তাঁহার মূত্রনালীর অপারেশন হইয়াছিল। তিনি মানিকগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৬১ সনে তিনি বয়েত গ্রহণ করেন এবং বিগত কয়েক বছর যাবৎ তিনি মোয়াল্লেম হিসাবে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত সেলসেলার খেদমত করেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার রূহের মাগফেরাত করুণ ও দারাজাত বৃদ্ধি করুণ। আমীন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

• The Holy Quran. with English Translation		Rs. 20·00
• Our Teachings –	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
• The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
• Psalms of Ahmed	,,	Rs 10·00
• What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
• Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
• The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
• The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
• Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
• The life of Muhammad (P. B.	,,	Rs. 8·00
• The truth about the split	,,	Rs. 3·00
• The economic structure of Islamic Society		Rs. 2·50
• কিসতিয়ে নূহ :	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)	Rs. 1·25
• Islam and Communism	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 0·62
• আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব :	মৌলবী মোহাম্মদ	Rs. 1·00
• The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
• ধর্মের নামে রক্তপাত :	মীর্যা তাহের আহমদ	Rs. 2·00
• তফসীরে সগীর : মির্যা বশিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ		Rs. 23·75
• ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মদ	Rs. 0·50
• ওফাতে ঈসা :	,,	Rs. 0·50

উক্ত পুস্তক সমূহ [illegible]

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা–১

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at **Zaman Printing Works.**
For the Proprietors, Bangladesh Anjuman Ahmadiyya, **4, Bakshibazar Road, Dacca – 1**
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.